২ অক্টোবর ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।

জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই! আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়!

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

OBM/2193-BEN

আনন্দমেলা

১৬ আশ্বিন ১৩৯২ ।। ২ অক্টোবর ১৯৮৫ ।। ১১ বর্ষ ১৩ সংখ্যা

পূজার নাটক

চাবি । শৈলেন ঘোষ ৩৫

গল্প

খুকুর বন্ধুরা । নবনীতা দেবসেন ৯

সেই রাতে । মুস্তাফা নাশাদ ১১

বড়গল্প

ভূত দেখানো । অজেয় রায় ২৪

ছড়া

জন্মদিনে । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫

ও বেনেবউ । সরল দে ৫

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৮

শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫১

শিকার-কাহিনী

বাঘের সন্ধানে । অর্ধেন্দু দত্ত ১৫

শার্লক হোমসের গল্প

মণিমুকুট । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৬

লেখাপড়া

গুণ···বাদাম (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৭

বাড়িতে নতুন খেলা (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৩

জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৪৭

ডাক্তারবাবু বলছেন

সাঁতার কাটবার আগে । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৪৭

খেলাধুলো

প্রথম টেস্টে ভারত বেঁচে গেল । অশোক রায় ৬২

'অ্যাশেজ' ইংল্যাণ্ডের । সম্রাট রায় ৬৩

খেলার মাঠে গণ্ডগোল । মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ৬৫

কলম্বোতে কী কাণ্ড । সুজয় সোম ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১

সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮

মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই এক সুর গেঞ্জি পরুন কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্

গেঞ্জি ● জাঙ্গিয়া

প্রস্তুতকারক

বাংলাদেশে আইনসম্মতভাবে বিক্রির জন্য প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার আবশ্যক ।

যোগাযোগ কেন্দ্র :

কোহিনুর নিটিং মিলস্

১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭

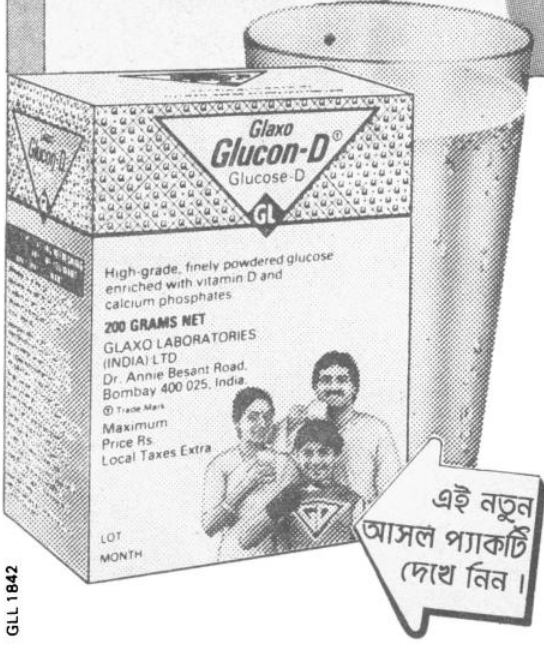

সগৌরব অবদান
গ্লুকন-ডি ®
সুপারহিরো
মায়ের
গর্বের
সুপারহিরো !
Glaxo
Glucon-D®
Glucose-D
GL
High-grade, finely powdered glucose enriched with vitamin D and calcium phosphates
200 GRAMS NET
GLAXO LABORATORIES (INDIA) LTD
Dr. Annie Besant Road, Bombay 400 025, India.
® Trade Mark
Maximum Price Rs.
Local Taxes Extra
LOT
MONTH
এই নতুন আসল প্যাকটি দেখে নিন।
গ্লুকন-ডি সুপারহিরো আসা মানে তো আপনার আদরের বাচ্চার জন্যে যেটি মনে-প্রাণে চান. তার সবকিছুই তো এতে পান— চঞ্চল, দুরন্ত, প্রাণপ্রাচুর্য অফুরন্ত. যার তুলনা কোথাও মেলে না !
আপনার বাচ্চাকে দিন এমন দারুণ পানীয়, যা সুপারহিরোর অতি প্রিয়—গ্লুকন-ডি ।
গ্লুকন-ডি-তে আছে গ্লুকোজ, ভিটামিন-ডি আর ক্যালসিয়াম ফসফেট. যা আপনার আমাদের বাচ্চাকে নিমেষে শক্তি যোগাবে আর সেও কি পড়াশুনায়, কি খেলাধুলায় সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে ।
তাহলে এখন, আপনার চোখের সামনে আপনারই আদরের সুপারহিরো দুরন্ত, চঞ্চল···গ্ল্যাক্সোর গ্লুকন-ডি'র দৌলতে প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল ।
গ্লুকন-ডি ®
নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয় সুপারহিরোর অতি প্রিয়
GLL 1842

জন্মদিনে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জন্মেছিলেন গুজরাতে কে ?
তারপরে কে বিলেত থেকে
ডিগ্রি নিয়ে, ব্যারিস্টারি
করতে আবার সাগর-পাড়ি
দিয়ে গেলেন আফ্রিকাতে ?
কালো লোকের মান বাঁচাতে
সেইখানে কে মরণপণ
হিংসাবিহীন আন্দোলন
করেছিলেন ? তারপরে কার
মুক্তিমন্ত্রে হাজার-হাজার
ভারতবাসী বারে-বারে
গিয়েছিলেন কারাগারে ?
'করব কিংবা মরব' কার
দীপ্ত বাণী প্রতিজ্ঞার ?
কে ইংরেজকে 'ভারত ছাড়ো'
হুকুম দিলেন বলতে পারো ?
দাঙ্গা রুখতে এগিয়ে যান কে ?
কে হিন্দু আর মুসলমানকে
ভিন্ন মানতে হননি রাজি ?
মহাত্মাজি ! মহাত্মাজি !

ছবি : দেবাশিস দেব

ও বেনেবউ

সরল দে

ও বেনেবউ, মকর হবি,
সই হবি তুই নাকি ?
এই আমি সেই খুব চেনা তোর
বউ কথা কও পাখি ।
তুই কেন রে একলা-পাখি
টরে-টক্কার তারে,
তিড়িক তিড়িক ল্যাজ নেড়ে যাস
রেললাইনের ধারে ?
আলোকলতায় পালক ঘষে
রোদের সোনাঝুরি,
ডানায় মেখে আয়না ও ভাই
এক চক্কর উড়ি ।
তুই কেন ঠায় আছিস বসে
হা-পিত্যেশ করে ?
কই বেনেবর ? আসছে সে কি
কু-ঝিক্-ঝিক্ চড়ে ?
আসবে কখন, তাক কুড়াকুড়
ঢাক বাজালে ঢাকি ?
কইবি কথা ও বেনেবউ,
ও বেনেবউ পাখি !

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে
এসেছেন যার ··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন
মমতার পরশ ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বরষিত হয়
আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে
গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন
অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J&J 23 2619 BG

অর্থ জানো

গুণ…বাদাম

এখন রেলগাড়ি, মোটর-কার, স্টিমার, এরোপ্লেনের যুগে নদীমাতৃক বঙ্গদেশে নৌকার কদর অনেক কমে গেছে। নীচের শব্দগুলি সবই নৌকা-সংক্রান্ত। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সর্বশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **গুণ টানা**—(ক) দড়ি দিয়ে নৌকা টেনে যাওয়া। (খ) স্রোতের টানে দড়ি দিয়ে নৌকাকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া। (গ) স্রোতের বিপরীত দিকে নিতে দড়ি দিয়ে নৌকা টানা। (ঘ) দড়ি দিয়ে নৌকাকে টেনে পারের কাছে নিয়ে আসা।

২। **বাদাম তোলা**—(ক) পাল গুটানো। (খ) মাস্তুল লাগানো। (গ) নোঙর তোলা। (ঘ) পাল তোলা।

৩। **ছিপ**—(ক) মাছ ধরার ছোট নৌকা। (খ) দ্রুতগামী সরু নৌকা। (গ) ধনী ব্যক্তির নদীতে বেড়ানোর নৌকা। (ঘ) বাণিজ্যের নৌকা।

৪। **সেঁউতি**—(ক) কাঠের পাটাতন। (খ) নৌকার কাঠের গলুই। (গ) কাঠের বৈঠা। (ঘ) নৌকার জল ছেঁচার কাঠের পাত্র।

৫। **দু মাল্লাই**—(ক) দ্বিগুণ মাল নেবার বড় নৌকা। (খ) যে নৌকা বহু মাঝিতে চালায়। (গ) যে নৌকা চালায় দুইজন মাঝি। (ঘ) যে নৌকা মাল নিয়ে ঘাটে দু-বার আসা-যাওয়া করে।

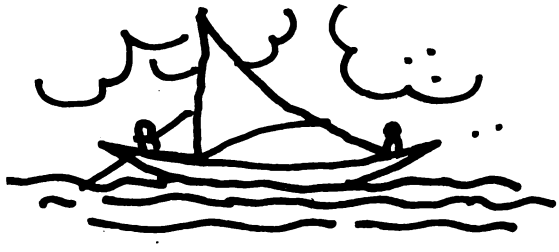

উত্তর : ১। **গুণ টানা**—(গ) স্রোতের বিপরীত দিকে নিতে দড়ি দিয়ে নৌকা টানা। যেমন—'একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম' (শরৎচন্দ্র)।

২। **বাদাম তোলা**—(ঘ) পাল তোলা। শব্দটি ফারসি বাদ্‌বান্‌ থেকে এসেছে, যার অর্থ নৌকোর পাল। যেমন—'বদরে বদর বলি তুলিয়া বাদাম' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)।

৩। **ছিপ**—(খ) দ্রুতগামী সরু নৌকা। যেমন—'দেখা গেল পাঁচখানা ছিপ সিপাহি-ভরা' (বঙ্কিমচন্দ্র)।

৪। **সেঁউতি**—(ঘ) নৌকার জল ছেঁচার কাঠের পাত্র। যেমন, 'সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে' (কবি ভারতচন্দ্র)।

৫। **দু মাল্লাই**—(গ) যে নৌকা চালায় দুইজন মাঝি। মাল্লা শব্দের অর্থ মাঝি। মূলে আছে আরবি শব্দ মল্লাহ্‌।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

বাড়িতে নতুন খেলা

চম্বল একটা দাবার সেট কিনে এনেছে। বাবা তাতে খুব খুশি, কিন্তু প্রথমটায় একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন। এত জিনিস থাকতে চম্বলের দাবার ওপর ঝোঁকটা পড়ল কেন?

Mr Roy used to play a lot of chess once. But that was a long time ago. His friends used to consider him clever at the time. He has read somewhere that you are at your best at chess when you're young. It's then that the mental powers required in chess are at their highest. But when he saw Chambal bring home a chess set he was pleased.

"I'd very much like to see if I'm any good at chess now," he thought.

"Why chess, Chambal?" he had asked in some surprise. "What put that into your head?"

Chambal said, "It was Nageswar of my class. He's very good at it himself, you know. Says it gives you intellectual exercise at its purest."

তারপর থেকে চামেলি প্রায়ই দেখে বাবা গভীর মনোযোগ দিয়ে একা-একাই দাবা খেলছেন, সামনে একটা দাবার বই খোলা।

And Milly notices that he is whistling softly.

She knows Daddy does that when he's thinking his hardest.

She remembers a particular occasion when she was going to a friend's birthday party. She was in her new party-dress and knew she was looking her prettiest.

Daddy just looked at her for a moment, and then his eyes returned to the chess-board.

Such a thing had never happened before.

এবারেও লক্ষ করো :

Adjectives in the superlative degree used as nouns:
He does it when he's thinking his hardest.
She was looking her prettiest.

আবার দ্যাখো :

You are at your best in chess when you are young.
It's then that the mental powers are at their highest.
It gives you intellectual exercise at its purest.

প্রসাদ

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে!
সুপর
रिन
सफ़ेदी की चमकार
RIN
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেণ্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
LINTAS RIN 32 2619 BG

কাকের ছানাটা অবিকল দাদার মতন…

ঝুমরি সারাদিন খুকুর পায়ের কাছে শুয়ে থাকে। ঝুমরির খুব মন খারাপ। খুকুর দিনের পর দিন জ্বর আর ছাড়ছেই না। ঝুমরির বেড়ানো বন্ধ, খেলাধুলো বন্ধ, স্নান বন্ধ, পাউডার মাখা বন্ধ। খুকু যখনই চোখ মেলে, দ্যাখে ঝুমরি শুয়ে আছে। আর খুকুর মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

ঝুমরির অফিস নেই বাবার মতো, কলেজ নেই মা'র মতো, ঝুমরির সবটা সময় কেবল খুকুরই জন্যে। হল্‌দিও আছে। হল্‌দিরও খুব মন খারাপ। সে পাড়া-বেড়ানোটা বাদ দেয়নি বটে, তবে বাকি সময়টা খুকুর বিছানায় শুয়ে-বসে থাকে। মা দেখলেই তাড়ান। একেই এত জ্বর, তার মধ্যে বেড়ালের লোম নাকে গেলে না জানি কী অ্যালার্জি হবে! ঝুমরি তো খাটে ওঠে না। ঠিক খাটের সামনে গালচের ওপর শুয়ে থাকে। ঝুমরিকে মা তাড়ান না। হল্‌দি তো কারুর কথাই শুনবে না। যতই তাড়াও সে আবার এসে খুকুর গা ঘেঁষে বসবেই। খুকুর খুব আনন্দ হয়।

হল্‌দিকে দেখতে ডোরাকাটা হলুদ বাঘের মতন হলে কী হবে, স্বভাবটা ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের মতন। কী ভালই যে বাসে বিস্কুট খেতে। সবাই বলে বেড়ালে আবার বিস্কুট খায় নাকি? তারা দেখে যাক এসে হলদিকে। বিস্কুট মানে যা-তা বিস্কুট সে খায় না। থিন অ্যারারুট দিলে শুঁকে চলে যায়। ও ভালবাসে স্ন্যাক্স, চিজ বিস্কিট, ক্র্যাকজ্যাক, এইসব। ক্রিম বিস্কিটও খায় না। ঝুমরি অবিশ্যি সর্বভুক। সবরকম বিস্কিট তো সে খায়ই, ছোলা-মটর ভাজাও খায় কটরমটর করে চিবিয়ে। ঝাল খায়, স্যালাড খায়, বেস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদও খায়। ঝুমরিটা খায় না কেবল সাবান, কাঠের গুঁড়ো, এইসব। নইলে ওকে ছাগলও বলা যেত। দেখতে তো ঠিক ভেড়ার মতন।

খুকুর ঘরের মধ্যে আরেকজন বন্ধু আছে। সে থাকে দেয়ালে। দাদুর বিশাল ফোটোটার পেছনে সুবিধেমতো শিকার করতে বেরোয়। কী দ্রুত দৌড়োয় রে বাবা দেয়াল বেয়ে। পাঁই-পাঁই করে ছোটে। পোকা দেখতে পেলেই হল। সেদিন রীতিমত মারামারি যুদ্ধ করে একটা বড় মথকে ধরল। মথটারই দোষ। খুকুর জ্বর। সে বেচারি কী করবে? বারবার ওকে বলে দিল, ডান দিকে টিকটিকি, ওদিকে যাসনি। সে তবু গেল। রাত্তিরবেলা তো মথেরা নাকি দেখতে পায়।

সেদিন খুকুকে বাবা কাগজ থেকে পড়ে শুনিয়েছেন বিলেতে একরকমের ফুল আছে, তারা দিনে লাল রঙ থাকে পাখি প্রজাপতিদের আকর্ষণ করবার জন্যে, রাত্রে সাদা রঙ হয়ে যায় মথেদের নজরে পড়বে বলে। তবে তো মথেরা নিশাচর। তবে তো তাদের দেখতে পাওয়াই উচিত ছিল যে, টিকটিকিটা গুঁড়ি মেরে-মেরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। খুকু একটা কাগজ গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল পর্যন্ত, কিন্তু বৃথাই। টিকটিকিটা তবু ধরে ফেলল মথটাকে। ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ দিয়েছিল অবিশ্যি মথটা, দারুণ ঝটপটি হল! এটাই

সবচেয়ে খারাপ লাগে খুকুর। শেষ পর্যন্ত কচরমচর করে খেয়ে ফেলল মথটাকে ফরসা ধবধবে টিকটিকিটা।

রোজ গন্ধ-সাবান দিয়ে ওর মা ওকে যেন স্নান করিয়ে দেয়, এত পরিষ্কার। আর ওর হাতের পায়ের নখগুলো ? খুকু খুব যত্ন করে দেখেছে, ম্যানিকিওর করা। সরু, শেপ্‌লি, ধবধবে পরিষ্কার নখ টিকটিকিটার। ওদের কি সেলুন আছে ? কেননা সব টিকটিকিই ওরকম নয় তা বলে। জানলার বাইরে বারান্দায় আরেকজন টিকটিকি আছে। খুকু তাকেও চেনে। সে কী ভয়ঙ্কর দেখতে। ঠিক যেন একটা ছোট কুমির। ঘরের টিকটিকিটা যেন গরদের পাঞ্জাবি পরে দাড়ি কামিয়ে নখ পালিশ করে পাউডার মেখে ঘুরে বেড়ায়। আর বারান্দারটা একেবারে বুনো। সারা গায়ে ফাটা-ফাটা দাগ। রং তো বিচ্ছিরি ময়লা, কালচে মতন, নখগুলো পর্যন্ত কালচে। নোংরা ভর্তি। কেবল চোখ দুটো পুঁতির মতন, ঠিক ঘরের এই টিকটিকির মতনই। দুজনকে জীবনে কথাবার্তা বলতে দেখেনি খুকু। ঘরেরটার বেশ ঘি-মাখন খাওয়া চেহারা, বাইরেরটা খিদে-খিদে, ভিখিরি-ভিখিরি। দেখলে খুকুর কেমন যেন ভয়-ভয় করে। ঘরেরটা ভদ্রলোক। বারান্দারটা যেন নিয়ানডারথাল মানুষ-টানুষের মতন। প্রাগৈতিহাসিক জীবের মিনি ভার্সন। ও আস্ত আরশোলা ধরে খায়, দেখেছে খুকু। ওঃ, ওই আরশোলা বস্তুটাকে খুকুর প্রচণ্ড ভয় করে। কী বিশ্রী চেহারা। হলদে-হলদে রিং-ওয়ালা চোখ। তার ওপর একবার যদি উড়ল তবে আর রক্ষে নেই। গায়ে বসলে খড়খড়ে কুরকুরে পায়ের ছোঁয়াতেই খুকুর অক্কা পাবার অবস্থা !

মা বলেছেন আরশোলা সবচেয়ে পুরনো প্রাণী। আর সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু। নিউক্লিয়ার যুদ্ধও যদি হয় তবুও আরশোলা বেঁচে থাকবে, মানুষ-টানুষ সব উড়ে যাবে যদিও। বাপ রে বাপ ! ভয় করবে না ? এমন রক্তবীজের ঝাড়কে ? যাকে ধ্বংস করা যায় না ? এই তো খুকুদের রান্নাঘরে আর বাথরুমে রাত্তির হল তো কে জানে কোন ফাঁকফোকর দিয়ে সারি-সারি আরশোলা বেরিয়ে আসে। খুকু তো ভুলেও রাত্তিরে রান্নাঘরে ঢোকে না, আর বাথরুমেও যায় না। ওই আরশোলার নাইট আর্মির ভয়ে। তবে শোবার ঘরে ওরা আসে না, ঝুমরি আছে, হল্‌দি আছে।

হল্‌দি সেদিন মা'র কাছে দারুণ পিট্টি খেয়েছে। বাইরে থেকে মরা ইঁদুর এনে যত্ন করে কার্পেটের ওপরে রেখে খাচ্ছিলেন তিনি ! আর বোকা ঝুমরিটা ঘাড় কাত করে করে মুগ্ধ নয়নে দেখেই যাচ্ছিল, কিছুই বলছিল না। মা বলেন খুকুর কুকুরটাও গাধা, খুকুর বেড়ালটাও গাধা, ছদ্মবেশী কুকুর বেড়াল সেজে আছে। হল্‌দির মা নেই, সে অনবরত ঝুমরির দুধ খায়। অথচ ঝুমরির দুধই নেই। কিন্তু সে দিব্যি হাত পা ছেড়ে গোরুর মা যেমন বাছুরকে দুধ দেয়, তেমনি শুয়ে পড়ে হল্‌দিকে দুধ খাওয়াতে। মা হেসে বলেন, "বোকার মরণ !"

ঝুমরি আর হল্‌দি বেস্ট ফ্রেন্ড। ওরা দুজনেই খুকুকে খুব ভালবাসে। এই যে খুকুর জ্বর হয়েছে হল্‌দিও খেতে চায় না, ঝুমরি তো খাওয়া-দাওয়া বন্ধই করেছে। দিন-রাত্তির কুকুর আর বেড়ালে খেলা করছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে, জড়াজড়ি করছে, এ ওকে চেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। যে দ্যাখে, অবাক হয়ে যায়। ঝুমরি আর হল্‌দির এই ভাব নিয়ে সবাই যেমন অবাক, তেমনি খুকু খুব গর্বিত। যেন এটা ওরই প্রাইভেট সার্কাস !

খুকুর জানলার বাইরেই একটা কদমফুলের গাছ আছে। তাতে একটা কাকের বাসা হয়েছে। প্রথমে ছোট-ছোট নীল ছিট-ছিট ডিম হল চারটে। তারপর কুচ্ছিত দেখতে চারজন কাকের ছানা বেরুল। খুকু রোজ ভাবত একটা অন্তত নিশ্চয় কোকিলের ছানা হবে, কেননা কোকিলরা নাকি বাসা বাঁধে না, কাকের বাসায় গিয়ে ডিম পেড়ে আসে। কাক-মা না বুঝে তাদের দিব্যি ধাই-মা হয়ে মানুষ করে দেয়। খুকু আশায়-আশায় ছিল, তাদের কদমগাছের কাকের বাসায় একদিন কুহু-কুহু বোল ফুটবে। তা ফুটল না। সবগুলোই কাকের ছানা। লাল-টুকটুকে হাঁ করে ওরা মুখ উঁচু করে বসে থাকে, মা-কাক এসে টুকুস-টুকুস করে ওদের ঠোঁটের মধ্যে খাবার গুঁজে দেয়। মা ঠিক যেমন করে খুকুকে গরাস পাকিয়ে ভাত খাইয়ে দেন, একদম তেমনি দেখায়।

একদিন খুকু দেখল বাসা খালি। বাচ্চা কাকেরা বড় হয়ে উড়ে গেছে। কিন্তু বারান্দাতে কাপড় শুকুতে দেবার একটা তার আছে। খুকু দ্যাখে, একটা ছোট্ট কাক, দেখেই দিব্যি বোঝা যায় সে পুরো বড় হয়নি, রোজ এসে ওই তারের ওপর বসে দোল খায়। তারটাও যে কী সুন্দর দোলে, ঠিক যেন পার্কের দোলনা। আনমনে অনেকক্ষণ দোল খেয়ে কাকটা একসময় উড়ে যায়।

একদিন খুকু দেখে, আরে ! ছোট কাকটার কাছে এসে বসেছে সেই মা-কাক। তার ঠোঁটে কী যেন খাবার। মা'কে দেখেই ছোট কাক ঠিক হাঁ করল। মুখের ভেতরটায় তার এখনও লাল রঙ রয়েছে, মা-কাক যেই মুখের মধ্যে খাবারটা ভরে দিতে যাবে, হঠাৎ ছোট কাকের কী যে মনে হল সে ঠোঁট বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নিল উল্টো দিকে। মা-কাক একটু অবাক হয়ে থেকে নিজেই খেয়ে ফেলল খাবারটা। আর খুকুর মনে পড়ে গেল দাদার কথা। দাদাটা একদিন খেতে বসে হঠাৎ মা'র হাতের গরাস মুখে না নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ঠিক এমনি করে, 'আমি এখন বড় ছেলে, নিজের হাতে খাই। মায়ের হাতে খাই না', এমনি একটা ভাব করে। আজ কাকের ছানাটা অবিকল দাদার মতন করল দেখে খুকু আনমনে খিক্‌খিক্ করে হেসে ফেলল, "ও সোনা, তুমি বুঝি বড় কাক হয়ে গেছ ? আর মায়ের হাতে খাবে না ? তবে দোলনা চড় যে বড় ?" বলে নিজের মনে হেসে উঠে খুকু পাশ ফিরল। এবারের 'আনন্দমেলা' হৈহৈ করে এসে গেছে। খুকুর পুরনো বন্ধু। এবার ওর সঙ্গে ভাব করতে হবে।

ছবি : দেবাশিস দেব

অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য মাইকেল ফ্যারাডেকে নাইট উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করা হলে তিনি সবিনয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি সারাজীবন শুধু মাইকেল ফ্যারাডে হয়েই থাকব।

কাঁলকেঁর সেঁদ্ধ ধান কুঁটতিঁ হঁবে না…

সেই রাতে

মুস্তাফা নাশাদ

টানা একমাস গরমের ছুটি। পড়াশোনার চাপ নেই। হোমওয়ার্ক যা দেওয়া হয়েছিল, তার বেশির ভাগই করা হয়ে গেছে। এখন সকাল-সন্ধে পড়াগুলো একটু ঝালিয়ে নিলেই হয়!

হাতে অঢেল সময়। শুয়ে-বসে, খেলেও আর সময় কাটতে চায় না। খেলার মাঠেও বন্ধুবান্ধবদের খুব একটা দেখা পাওয়া যায় না। গরমের ছুটি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা সিমলা, দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীর গিয়েছে। আমার কিন্তু কোথাও যাওয়া হল না। তাই সব সময় আমি মনমরা হয়ে থাকতাম। রাঙাকাকু আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে একদিন বললেন, “পাপানবাবু, চলো ফুলপিসির বাড়ি ফরিদকাটি ঘুরে আসি। বেড়াবার পক্ষে জায়গাটা নেহাত মন্দ না। এক্কেবারে ইছামতীর ধারে। তাছাড়া সোনালি গোঁফঅলা [illegible]পসে মাছের ঝোল আর গলদা চিংড়ির মালাই[illegible] আছেই!”

রাজি হয়ে গেলাম [illegible] যা পাওয়া যায় তাই লাভ! তা না হলে তো এ-বছর কোথাও আর যাওয়াই হবে না।

পরদিন সকালবেলা রাঙাকাকুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। শ্যামবাজার থেকে বাসে না গিয়ে পাতিপুকুর থেকে মার্টিন কোম্পানির রেলে যাওয়াই ঠিক করলেন কাকু। উদ্দেশ্য বেশি সময় ধরে রূপসী বাংলাকে দেখতে দেখতে যাবেন আর কি!

উত্তম প্রস্তাব। আমিও সায় দিলাম। শহরে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখানে শুধু ইঁটের পর ইঁট। সবুজের বড় অভাব। কাছেপিঠে কোথাও খোলামেলা জায়গা বা তেমন কোনও পার্কও নেই। গাঁটের কড়ি খরচ করে ধর্মতলায় গেলে তবেই কার্জন পার্কের ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগবে।

ন'টা পঁয়তাল্লিশে ট্রেন ছাড়ল। হেলতে-দুলতে, ঝমঝম করতে-করতে, সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলতে শুরু করল। কখনও কারও বাড়ির পাশ, কখনও কারও পুকুর ঘেঁষে। আবার কখনও কারো হেঁশেল উঁকি দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি।

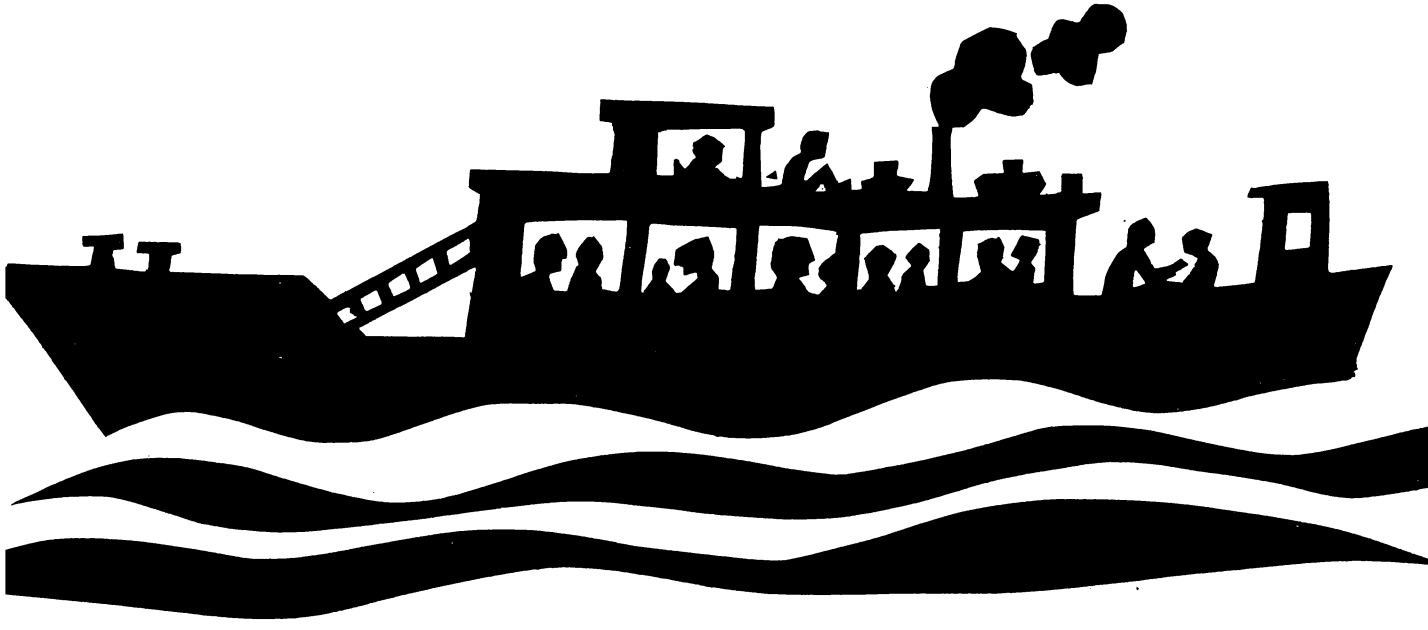

ছোট্ট বন্ধুরা। দারুন উত্তেজনার মুহূর্তগুলি এসে গেছে...

বুস্ট অন্তরীক্ষ অভিযান

বিখ্যাত সব মহাকাশ অভিযান ও অভিযানের নায়কদের রঙ বেরঙের ছবি সংগ্রহ কর। এড্রইন অলড্রিন চাঁদে হাঁটছেন; ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা; মহাকাশে ভ্রমণকারী প্রথম প্রাণী লাইকা কুকুরটি এবং এরকম আরো কত ছবি!

উত্তেজনায় ভরা বুস্ট অ্যালবাম দেখতে দেখতে তোমরাও পাড়ি দিতে পার মহাকাশের মনোমুগ্ধকর জগতে।

মহাকাশ যাত্রার কাহিনী, ভবিষ্যতের অন্তরীক্ষ উপনিবেশ এবং সুদূরের নক্ষত্র ও গ্রহরাজি সম্পর্কে কতরকমের খবরই না চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

হ্যাঁ, তোমাদের খুশি হওয়ার মতো আকর্ষনীয় অনেক কিছু এতে আছে। সুতরাং মহাকাশযাত্রার হেলমেট পরে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

অভিযান 1:
বিনামূল্যে কার্ড
প্রতি 500 গ্রামের প্যাকের সংগে একটি।

অভিযান 2:
বিনামূল্যে অ্যালবাম
2 টি কার্ড সংগ্রহ করলে।

12 পৃষ্ঠার এই অ্যালবামে আছে অন্তরীক্ষের আশ্চর্যময় জগতের চমৎকার চিত্র কাহিনী।

HMM-8726BEN

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

জার্নিটা মন্দ লাগছিল না। অন্য কোথাও গিয়ে এত আনন্দ পেতাম কি না জানি না। গাড়ি যখন বসিরহাট পৌঁছল, বেলা তখন তিনটে।

গাড়ি থেকে নেমে একপেট লুচি-মাংস খেলাম। তারপর কাকুর সঙ্গে গিয়ে লঞ্চে উঠলাম। ইছামতীর ঢেউ কেটে-কেটে, তির-তির করে এগিয়ে চলল আমাদের লঞ্চ। দেখতে-দেখতে জহরপুর, মেটে সাংবেড়ে, তারাগুনে ও গঞ্জের বড়হাট বাদুড়িয়াকে পিছনে ফেলে ক্রমেই ফরিদকাটির দিকে এগিয়ে চলল লঞ্চ।

সন্ধের মুখে-মুখে বাড়ির কাছে গিয়ে লঞ্চ থামল। লঞ্চ থেকে একখানা তক্তা ফেলে দেওয়া হল ডাঙায়। তার উপর দিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে সাবধানে আমরা ডাঙায় নামলাম। ডাঙা মানেই ফুলপিসির বাড়ি! দোরগোড়া থেকেই লঞ্চে ওঠা-নামা। লঞ্চ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে কচিকাঁচার দল ভিড় করে দাঁড়াল নদীর ধারে। আমাদের দেখে সবাই খুব খুশি।

রান্নাঘর জুড়ে খুব জম্পেশ করে রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হল। খুব কম করেও ত্রিশ-চল্লিশটা পাত পড়েছিল সেদিন। তোপসেমাছের ঝোল। গলদা চিংড়ির মালাইকারি। রুইমাছের কালিয়া। নারকেল কোরা দিয়ে মুগের ডাল। ডিমের পুডিং। ছানার ডালনা। আরও কত কী!

খাওয়া-দাওয়ার পাট নির্বিঘ্নেই চুকল। গোল বাধল শোবার ব্যাপার নিয়ে। রাঙাকাকু কিছুতেই বাড়ির ভিতর শোবেন না। একে তো ফ্যান নেই, তাতে আবার গাছের পাতাও নড়ছে না! খুব গুমোট। গরমের দিনে কোথায় ফুরফুরে দখিনা বাতাস বইবে, প্রাণ জুড়োবে। তা না, বিশ্রী রকমের ভ্যাপসা গরম। কল-কল করে ঘাম পড়ছে। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। গায়ে তালপাখার বাতাস লাগিয়েও শরীর জুড়োচ্ছে না কিছুতেই!

"মরে গেলেও আমি ঘরের ভিতরে শোব না," রাঙাকাকু দারুণ রেগে গিয়ে বললেন। "তাতে যা হয় হোক। কুছ পরোয়া নেই।"

ফুলপিসি রাঙাকাকুর কথা শুনে ধমক দিয়ে বললেন, "তোর সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি শিবু। এটা শহর নয়, গাঁ-গ্রাম। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারপর নতুন জায়গা। বাচ্চাটার হয়তো ঘুমই হবে না।"

"বকবক করিস না তো দিদি," রাঙাকাকু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই পচা গরমে ঘরের মধ্যে শুয়ে সিদ্ধ হতে পারব না আমি।"

"ওরে গবেট," ফুলপিসি এবার হাসতে-হাসতে বললেন, "বাইরে শুলে যে ও ভয় পাবে। তা খেয়াল আছে? কত রকম শব্দ শুনতে পাবে! সেটা একবারও ভেবে দেখেছিস কী?"

"ভয় পাবে!" রাঙাকাকু মুখ ভেংচে বললেন, "কিসের ভয়? ভূতের ভয়! ও-সব ভয় করি না আমরা। কী গো পাপানবাবু, তোমার কী মত?"

কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। তেনাদের দেখিনি অবিশ্যি! তবে ভয় যে এক্কেবারে করে না, তাই বা বলি কী করে? আবার বললেও যে রেহাই পাব, তাও নয়। সকাল হলেই তো সবাই খ্যাপাবে আমাকে। কাজে-কাজেই চুপ করে থাকাটাই ভাল মনে করলাম। কারণ বোবার শত্রু নেই। তাই আর মুখ খুললাম না। শুধু একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসলাম। যে-যা বোঝার বুঝুক।

অগত্যা আমার আর রাঙাকাকুর শোবার ব্যবস্থা হল বাড়ির উত্তরদিকের দালানে। দক্ষিণদিক পুরো খোলা। যতদূর নজর যায়, শুধু মাঠ আর মাঠ। বাতাস বইলে যে ঝড় বয়ে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শেষ রাতের দিকে একটু শীত-শীতও করতে পারে। তাই ফুলপিসি দুজনের জন্যে দুটো সুজনি কাঁথাও দিয়ে দিলেন। বৈঠকখানার পুবদিকে ঢেঁকি ও ধানের গোলা। পশ্চিমদিকে বিরাট এক ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ!

মাথার কাছে লণ্ঠনটা কমিয়ে 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা' বলে আমি ও রাঙাকাকু ঘুমিয়ে পড়লাম। জায়গা নিয়ে রাঙাকাকুর কোনও বাছবিচার নেই। বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করলেন তিনি। আমার চোখে কিন্তু ঘুম আর আসে না। অচেনা জায়গা। তারপর খোলামেলা। বাতাসে কত বিচিত্র রকমের শব্দ ভেসে আসছে। কখনও মনে হচ্ছে কারা যেন আশেপাশে ফিসফাস করছে। আবার পর মুহূর্তেই মনে হল ফিসফাস নয়, কিসের যেন হিসহিস শব্দ! খুব কাছেই কে যেন ফ্যাচ-ফ্যাচ করে হেসে উঠল। অমনি আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। কাকুকে বারদুয়েক ঠেলা দিলাম। তিনি ঘুম-জড়ানো চোখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"ওই শোনো, কারা যেন ফ্যাচ-ফ্যাচ করে হাসছে!"

রাঙাকাকু কিছুক্ষণ কান খাড়া করে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর হাসতে-হাসতে বললেন, "খটাশ রে বোকা, খটাশ! ওদের আওয়াজ ঠিক হাসির মতো শোনায়। নে, ঘুমিয়ে পড়।" বলেই রাঙাকাকু আবার নাক ডাকতে শুরু করলেন।

রাত তখন ক'টা? জানি না! আকাশে ভাঙা মালসার মতো চাঁদ উঠল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল দুধরঙ জোছনা। আমার মনের ভয়ও কিছুটা কাটল। এক সময় আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। আজ রাতটা ফর্সা হলে আর বাইরে ঘুমোচ্ছিনে বাবা! যতই কষ্ট হোক আর যতই গরম লাগুক। মনে-মনে ঠিক করলাম।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলাম, তা ঠিক বলতে পারব না। মাথার কাছে কাদের ফিসফাস করে কথা বলার শব্দ শুনে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি কী, এক হাত করে ঘোমটা-টানা দুজন মেয়ে সাদা ধবধবে শাড়ি পরে আমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওই দৃশ্য দেখে আমি তো আর নেই। ভয়ে মুখ শুকিয়ে চুন। কোনও কথা সরে না মুখে। অমন ভ্যাপসা গরমেও গায়ে আমার শীতকাঁটা দিল। সারা শরীর ভয়ে অবশ হয়ে এল। পাশে শোওয়া রাঙাকাকুকে যে ডাকব, সে শক্তিটুকুও আমার নেই!

"কী রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চঁ-চঁ।" একজন বলল।

"এঁকটা লোক রঁয়েছে নাঁ!" অন্যজন ঘোমটাটা আরও একটু টেনে দিয়ে বলল।

"থাঁকতি দেঁ! চঁ, তাঁড়াতাঁড়ি চঁ। কাঁলকেঁর সেঁদ্ধ শুঁকনো ধান কুঁটতি হঁবে নাঁ?" প্রথমজন অভয় দিয়ে বলল ও আমাদের মাথার কাছ থেকে সোজা হেঁটে ঢেঁকির কাছে গিয়ে থামল। তারপর একজন ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করল, অন্যজন ধান। দু'জনে মিলে ধান কুটতে শুরু করল। সেই দৃশ্য দেখে আমি তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালভাবে

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে, তাই সংক্রমণ দূর করে ও চটপট সারিয়ে তোলে।

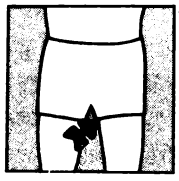

ধোবিজ ইচ্—সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয়। 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন।

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায়। দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান।

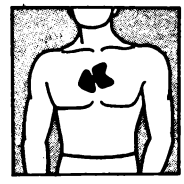

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে। অবহেলা করবেন না—উপশমের জন্যে 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে— যে-কোনো সময়েই। প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায়। ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

তাড়াতাড়ি ত্বকে ছোঁকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ছুঁকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয়।

ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায়।

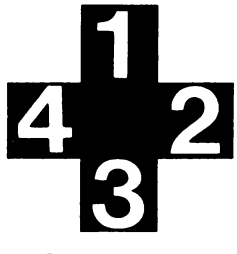

চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না।

ছত্রাকজনিক সংক্রামণ রোধে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা ওঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

1148 BEN

PRAGMATAR®
Ointment of Cetyl Alcohol, Cetyl Tar Distillate, Sulphur and Salicylic Acid 2%

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKF —AN ESKAYEF PRODUCT © Eskayef Limited

কাঁথামুড়ি দিয়ে সিটকে পড়ে রইলাম। আমার মনের মধ্যে তখন হাপর চলছে!

কতক্ষণ তারা ধান কুটল তা বলতে পারব না। তবে ঢেঁকির ঢেকুস্-কুস্ শব্দে আর তাদের গালগল্পের আওয়াজে যখন রাঙাকাকুর ঘুম ভাঙল, তখন দারুণ এক অঘটন ঘটল। রাঙাকাকু তাদের দেখেই 'ভূ-ভূ-ভূত' বলে জ্ঞান হারালেন!

রাঙাকাকুর ভূ-ভূ-ভূত বলে চিৎকার শুনে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে বৈঠকখানার দালানের দিকে ছুটে এল। এসে সবাই দেখল যে, রাঙাকাকু দারুণ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন আর তখনও তারা দুজনে নিশ্চিন্তে ধান কুটছে! কোনও দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। ওদের এভাবে ধান কুটতে দেখে কেউ কিন্তু ভয় পেল না। এ যেন রোজকার ব্যাপার। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

রাঙাকাকুর মাথায় জলটল দেওয়া হল। চামচে দিয়ে দাঁত ছাড়ান হল। অজ্ঞান হবার সময় দাঁতে দাঁত বসে গিয়েছিল তাঁর। কাকুর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ফুলপিসি বিদ্রূপ করে বললেন, "ঢের হয়েছে। আর বীরত্ব ফলাতে হবে না। যার ভূতের ভয় এত, তার আবার বাইরে শোবার শখ কেন?"

"ত-তবে কি ও-ওরা ভূ-ভূত না!" কাকুর তখনও ভূতের ভয় কাটেনি। তিনি ঢোঁক গিলে বললেন।

"না গো মশাই না! ওরা মোটেই ভূত না!" ফুলপিসি হাসতে হাসতে বললেন।

"তবে কে ওরা," রাঙাকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "ভূতই যদি না হবে, তাহলে নাকি সুরে কথা বলছিল কেন?"

ফুলপিসি বললেন, "ওরা দুজনে টেপি ও টেপির মা। মায়ে-ঝিয়ে রোজ এই সময় আসে ধান ভানতে। অনেক দূরে থাকে কি না, তাই। আর ওরা দুজনেই খোনা। তাই নাকি সুরে কথা বলে!"

সকাল বেলা ছেলে-বুড়ো সবাই রাঙাকাকুকে খ্যাপাতে শুরু করল। রাঙাকাকু লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকলেন। কী আর করবেন? আজ হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন যে! তারপর হাতমুখ ধুয়ে সবাই যখন জলখাবার খেতে বসলাম, ঠিক তখনই একটা দশ-বারো বছরের ছেলে এল ফুলপিসির কাছে। উদোম গা। পরনে একটা তাপ্পিমারা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট। মাথায় কদমছাঁট চুল। দোহারা চেহারা। কাঁদো-কাঁদো মুখ। জলে ভরা দু'চোখ। তাকে দেখে ফুলপিসি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার রে ট্যাপা? হঠাৎ সকাল না হতেই···।"

উত্তরে ছেলেটি নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুই চোখ থেকে ঝরছে অঝোরে জল। কিছুতেই আর চোখের জল থামে না। অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলে বললে, "ঘাটকাজের জন্যি কিছু টাকা দিতি হবেক গো মা ঠাউরন।"

"কার ঘাটকাজের জন্য রে?" তার কথার মানে না বুঝতে পেরে ফুলপিসি জিজ্ঞেস করলেন।

"মা ও দিদির," ছেলেটি এবার চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, "কাল রেতের বেলা তুমাদের ইখানে আসার পথে সাপে কামড়ালি···।"

ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই ফুলপিসি 'ভূ-ভূ-ভূত' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন!

ছবি : প্রবীর সেন

বাঘের সন্ধানে

অর্ধেন্দু দত্ত

আসামে থাকাকালীন রাজা গিরীশচন্দ্র রায়ের পৌত্র রায়রায়ান গৌরীশের সঙ্গে বহু বন-জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছি। একবার তাদের জমিদারির কাছারি-বাড়ি রাজারামপুর থেকে পুব-পাহাড়ে যাই শুয়োর শিকার করতে।

আমি বরাবরই শখের শিকারি। শিকারিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো আর জন্তু-জানোয়ারের জীবনযাত্রা স্টাডি করাই আমার উদ্দেশ্য।

প্রতি বছরই পুব-পাহাড়ে ওদের কিছু জমিতে আখ লাগানো হয়। সন্ধ্যার মুখে শুয়োরের পাল প্রায়ই আখখেতে ঢুকে আখ নষ্ট করে দিয়ে যায়—চৌকিদারের রিপোর্ট।

ঠিক হয়, আজ সন্ধ্যার পরই শুয়োর নিধন করা হবে।

রাজবাড়ির হাতি চড়ে আমি, গৌরীশ, মাহুত ও বিশ্বস্ত চৌকিদার বনমালী আখখেতের দিকে রওনা হই।

সঙ্গে গৌরীশের ৪০৫ বোরের শক্তিশালী রাইফেল। আমি নিরস্ত্র, হাতে পাঁচ ব্যাটারির একটি টর্চ। বনমালীর কাছে নেপালি কুক্‌রি ও লাঠি।

সমতল ভূমি ছেড়ে সবেমাত্র আমরা বনে ঢুকেছি, এমন সময় দেখি চার-পাঁচজন লোক আহত একজনকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসছে।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, লোকটি বনের প্রান্তে গোরু চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি বাঘ গোরুর পাল থেকে একটি গোরুকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। তখন রাখাল বাধা দেয়। ফলে বাঘ এক থাবায় রাখালের পিঠের একখণ্ড মাংস তুলে নেয়।

বনে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটছিল। তারা এ-ঘটনা দেখতে পায়। তাদের হৈ-চৈ ও চিৎকারে এবং গোরুগুলির সমবেত আক্রমণে বাঘ গোরুটিকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

বাঘ যখন মানুষ ছেড়ে গোরুকে ধরেছে, তখন স্পষ্টই বোঝা যায়—বাঘটি মানুষখেকো নয়। আর সামান্য হৈচৈ শুনে বাঘটি যখন পালিয়েছে, মনে হয় খুব বড় আকারের বাঘ নয় এবং শিকারেও দক্ষ হয়ে ওঠেনি।

কাঠুরিয়ারা গোরুগুলিকে পাশের গ্রামে রেখে লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। কাছেই ছোট একটি হাসপাতাল রয়েছে।

গৌরীশ আমাকে ননীদা বলে ডাকে। বলে, "চলো,

আলো চুরির রহস্য ...

গভীর রাত। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় বিদ্যুৎ তৈরির কারখানাগুলি কেবল জেগে রয়েছে। কোথাও কয়লা জ্বালিয়ে জল থেকে বাষ্প তৈরি করে তা দিয়ে প্রকাণ্ড টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। কোথাও পাহাড়ী নদীর খরস্রোতে ঘুরছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন। কোথাও বা ডিজেল তেল দিয়ে গম গম শব্দে ডিজেল টারবাইন চলছে।

বিদ্যুৎ তৈরি করার কাজে ব্যস্ত আছেন কয়েকটি মানুষ। রাত জেগে তাঁরা টহল দিচ্ছেন কারখানার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এ ছাড়া গ্রামে, শহরে, গঞ্জে সমস্ত মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছেন।

জেগে রয়েছে আরও একজন। ১৪ বছর বয়সের বাবলু। দারুণ ফুটবল খেলে। ওর ছিল পরের দিন পরীক্ষা। রাত জেগে বেজায় মনযোগ দিয়ে পড়ছিল। ঘুম যে একেবারেই পাচ্ছিলো না তাও নয়। একবার উঠে কুঁজো থেকে জল নিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে এলো। তার পড়ার টেবিলের পাশের ছোট জানালাটা দিয়ে দেখা যায় রাস্তার আলোগুলি জ্বলছে, তার বাইরে আর কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ পাশের মাঠে ফটাস করে একটা শব্দ হোল। সঙ্গে সঙ্গে সব আলো নিভে গেল। মাথার ওপর পাখা থেমে গেল। নিশ্চয়ই লোডশেডিং। কিন্তু অন্ধকারেও বাবলু দেখতে পেলো অনেকগুলো ছায়া মূর্তি মাঠের মধ্যে ঘোরা ফেরা করছে। বাবলু প্রথমেই গিয়ে ওর বাবা কাকাদের ডেকে তুললো। তাঁরা সব বড় বড় টর্চ, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন মাঠের মধ্যে। গর্জে উঠলো বাবলুর বাবার গলা "কে যায় ? খবরদার পালানোর চেষ্টা করো না।" একসঙ্গে জ্বলে উঠলো অনেকগুলি টর্চ। দেখা গেল একদল লোক ইলেকট্রিক লাইনের তার কেটে, বাবলুদের বাড়ীর কাছেই মাঠের কাছে পোস্টের উপর বসানো ট্রান্সফরমারটা ভেঙ্গে তার অংশ ইত্যাদি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। বাবলুদের চিৎকারে ওদের ঘিরে ফেললো গ্রামের সব লোক। ততক্ষণে খবর পেয়ে রক্ষী বাহিনী এসে ধরে ফেললো তাদের।

থানায় খবর গেল। লোক ছুটলো সাপ্লাই অফিসে খবর দিতে। সাপ্লাই অফিস থেকে লোকজন এসে গেলেন। লাইন সারাবার কাজে হাত পড়লো। সবাই বাবলুর সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির দারুণ প্রশংসা করলেন।

বাবলুর মত তোমরাও খেয়াল রেখো। আমরা জানি চোখের সামনে এরকম ঘটনা ঘটলে বাবলুর মতো সাহসের পরিচয় দিতে তোমরাও নিশ্চয়ই পিছপা হবে না। কারণ এই রকম ঘটনায় কেবল বিদ্যুৎ পর্ষদেরই ক্ষতি হয় না—ক্ষতি তোমার আমার সবার।

পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

TCP/SEB 934/85

বাঘটাকে ফলো করা যাক। ফেরার পথে সময় থাকলে শুয়োর মারা যাবে।"

বললাম, "সঙ্গে মাত্র একটি রাইফেল। সন্ধ্যা হয়ে এল। এ অবস্থায় যাওয়া কি ঠিক হবে?"

গৌরীশ অবশ্য পাকা শিকারি।

তার উৎসাহেই আমরা বাঘের পেছনে রওনা হলাম।

হাতি সাধারণত বেতবনে যেতে চায় না। কিন্তু সামনেই বেতবন। বেতবনের কাঁটা যে কী ভয়ানক তা হয়তো অনেকেই জানেন না। সে কাঁটা ঠিক বঁড়শির মতো। গায়ে লাগলে মাংস তুলে নেয়। জামা-কাপড়ে লাগলে তা একেবারে ছিঁড়ে যায়। এসব বনে খুব সাবধানে চলতে হয়।

অঙ্কুশের ঘা দিয়ে মাহুত হাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

খানিক গিয়ে দেখি নরম মাটির ওপরে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ। ছাপটি মাঝারি আকারের। সেই ছাপ অনুসরণ করে একটি ছোট নালার ধারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু বাঘের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

একটু পরই আকাশে চাঁদ দেখতে পেলাম। নিস্তব্ধ বনভূমি চাঁদের আলোতে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে—চারদিকে শ্যাম বৃক্ষপত্রে জ্যোৎস্না পড়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।

সময়টা শরৎকাল। মাঝে-মাঝে সাদা মেঘে চাঁদ দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। আর ঝোপঝাড় সব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে কী রকম যেন এক ভৌতিক চেহারা নিয়েছে।

হঠাৎ অদূরে কিসের যেন ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ ও হাড় চিবনোর স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম। গৌরীশকে চুপিচুপি বলি, "নিশ্চয়ই ঝোপের ভিতরে বাঘ আছে।"

গৌরীশের হাতে রাইফেল, কোনও রকমে সাবধানে আমরা সেই ঝোপের ভিতরে ঢুকে পড়ি। খানিকটা যেতেই দেখি, বেশ একটু পরিষ্কার জায়গা, তার মধ্যে দুটো শেয়াল গোরু অথবা ছাগলের ঠ্যাঙ নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছে। সেটা যে বাঘের আস্তানা, তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

বাঘমহাশয় বাড়িতে ছিলেন না। গোরুটিকে ধরতে না পেরে হয়তো অন্য শিকারের সন্ধানে বের হয়েছেন। এই ফাঁকে সুচতুর শেয়ালেরা সুযোগ বুঝে প্রভুর খাদ্যে ভাগ বসিয়েছে। সমস্ত জায়গা জুড়ে শুধু গোরু আর ছাগলের কঙ্কাল।

বেতবন ছেড়ে নালার পাশ দিয়ে আমরা রওনা হই। আবার বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখতে পাই। সামনেই একটু সমতল জায়গা। তারপর ডানদিকে ছনখেত। ছন খেতে বাঘের আত্মগোপন করা স্বাভাবিক। হাতির গতি যেন একটু মন্থর হয়।

মাহুত বলে, "সাব্, সামনের ছনখেতেই বোধহয় বাঘ আছে।"

যেই আমরা নালাটির বাঁক ঘুরে ওপারে যাব, দেখি সামনের নালায় আড়াআড়ি বসে বাঘ নির্বিবাদে জল খাচ্ছে।

গুলি করার মতো সুযোগ ছিল না। কারণ বাঘের পেছনের অংশ আমরা দেখতে পাই।

হঠাৎ বাঘ আমাদের অবস্থান জানতে পেরে বিকট গর্জন করে একলাফে সামনের ছনখেতে ঢুকে পড়ে।

আমাদের অনুমানই ঠিক। বাঘটি ছিল মাঝারি আকারের। গর্জনে বোঝা গেল বাঘের বাচ্চা বাঘই। গর্জনে মাটি যেন কাঁপছে।

সামনেই গভীর বন। হাতিও যেন ওই বনে যেতে ইচ্ছুক নয়। রাতও ঘনিয়ে আসছে। চাঁদের আলো মাঝে-মাঝে বেশ উজ্জ্বল, আবার মেঘে ঢাকা পড়ে আকাশ এক-একবার অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

ঠিক করি, ফিরে যাওয়াই ভাল।

সেই বেতবনের কাঁটাঝোপের পাশ দিয়ে ফিরছি। শেয়ালদের কড়মড়িয়ে হাড় চিবোনোর শব্দ আর কানে আসছে না।

গৌরীশকে কানে-কানে বলি, "বাঘ কি তার বাসস্থানে ফিরে এল? শেয়ালদের যে কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।"

বেতঝোপের কাছাকাছি এসে একটু দাঁড়িয়েছি। অমনি মনে হল যেন শুকনো পাতার মচমচ শব্দ। কান পেতে শুনি পাতার শব্দই বটে। পথের ডান দিকে হাতিকে সরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়াই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে স্পষ্ট দেখি, বেতবনে ঘাসের মাথা নড়ছে। তারপরই একটা মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যায়।

হাতি 'রায়ডাক' একটু নড়েচড়ে ওঠে। রায়ডাক অবশ্য বহু শিকারের অভিজ্ঞ দর্শক।

ঝোপটা আমাদের কাছ থেকে দশ-বারো হাতের বেশি হবে না। বাঘ হয়তো লাফ মারবে নতুবা আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে সামনের ঘন বনে যাবার মতলব করছে।

বাঘটির চলাফেরা দেখে মনে হয়, বাঘটি মানুষখেকো নয় এবং শিকারেও অভিজ্ঞ নয়।

যা ভেবেছি তাই। বাঘ ঠিক রাস্তার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গেই বাঘের মুখে টর্চের জোরালো আলো ফেলি, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দুটো চোখ যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে। আর গৌরীশের রাইফেল সেই মুহূর্তেই গর্জে ওঠে। অব্যর্থ লক্ষ্য।

গুলির ধোঁয়া মেলানোর সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পাই, বাঘ ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

একটু পরেই বাঘ একেবারে নীরব হয়ে যায়।

গুলিটা ঠিক বাঘের বুকে লেগেছিল। দ্বিতীয় গুলি করার আর সুযোগ হয়নি।

বাঘটি ছিল মাঝারি আকারের। দৈর্ঘ্যে নেহাত কম নয়, ছয় ফুট সাত ইঞ্চি।

ছবি : অনুপ রায়

জেমস জয়েস তাঁর 'ফিনিগানস ওয়েক' উপন্যাসটি লেখেন সতেরো বছর ধরে। বারোটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এই উপন্যাসে, আর এর মধ্যেই আছে এক হাজার দ্ব্যর্থবাক্য।

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে এক মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে চান। সন্দিগ্ধ দুই ভাই পালিয়ে যে বাসে ওঠে, তাতে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। গজ-পালোয়ানের ডেরায় ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। উটকো লোকটার নাম আপাতত পঞ্চানন্দ। মধ্যরাতে তিনটে ছায়ামূর্তি শিবুবাবুর ল্যাবরেটরির দিকে এগোয়। পঞ্চানন্দ ন্যাড়াকে বলে, তারা গজ-কুস্তিগিরকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কবি হরিবাবুর বাজারের ভার পঞ্চানন্দ নিয়েছে। গজের ডেরায় গিয়ে সে রহস্যময় যান্ত্রিক শব্দ শোনে। বাড়িতে ফেরার পর ঘড়ি ও আংটি তাকে পাকড়াও করে বলে, সব কথা "খোলসা করে বলো।" তারপর···

হরিবাবুর খোকা দুটি যে বিশেষ সুবিধের নয়, তা পঞ্চানন্দ লহমায় বুঝে গেল। ওদের একজন হল গোমড়ামুখো গুণ্ডা, অন্যটা ছ্যাবলা গুণ্ডা। ছ্যাবলাদের তেমন আমল না দিলেও চলে, কিন্তু গোমড়াগুলোই ভয়জনক। কখন কী ভাবছে তা মুখ দেখে টের পাওয়া যায় না। তবে যতই গুণ্ডা হোক, পঞ্চানন্দ লক্ষ করেছে যে, ওরা ওদের বাপকে সাঙ্ঘাতিক ভয় পায়।

চানটান করে পঞ্চানন্দ যখন গিয়ে খেতে বসল, তখন দুপুর বেশ গড়িয়ে গেছে। এ-সময়ে গরম ভাতের আশা বৃথা। পঞ্চানন্দ ধরে নিয়েছিল, ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত আর তলানি কিছু ডাল-তরকারি জুটতে পারে।

কিন্তু খেতে বসার পর বামুনঠাকুর যখন ধোঁয়া-ওঠা ভাত আর গরম-গরম ডাল-তরকারি আর মাছের ঝোলের বাটি সাজিয়ে দিল, তখন রীতিমত অবাক। ভাত ভাঙতে-ভাঙতে বলল, "জরুরি একটা কাজে গিয়েছিলুম কিনা, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।"

রাঁধুনি বিনয়ের সঙ্গে বলল, "তাতে কী বাবু? ওরকম হয়েই থাকে।"

পঞ্চানন্দ খেতে-খেতে বলল, "শেষপাতে একটু দই না হলে আবার আমার তেমন জুত হয় না।"

"আজ্ঞে, আছে। দই, কলা, চিনি, সব সাজিয়ে রেখেছি।"

"বাঃ বাঃ, তুমি তো কাজের লোক হে। নাঃ, বাবুকে বলে তোমার মাইনেটা দু'পাঁচ টাকা বাড়িয়ে না দিলেই নয়।"

রাঁধুনি লাজুক মুখ করে একটু হাসল। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আপনি যে কী একটা পুঁটুলি আমার কাছে রাখবেন বলেছিলেন।"

পঞ্চানন্দ চট করে একটু ভেবে নিল। কখন কাকে কী বলে, তা তার হিসেবে থাকে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, রাত্রে এরকম একটা কথা বলেছিল বটে রাঁধুনিকে। মনে পড়তেই একটু হেসে বলল, "কথাটা বলে ভালই করেছ। পুঁটুলিটা নিয়েই দুশ্চিন্তা। সোনাদানা কিছু তার মধ্যে আছে বটে, তবে বেশি নয়। বারো-চোদ্দ ভরি হবে মেরেকেটে। শেরপুরের রাজা একখানা মুর্গির ডিমের সাইজের হিরে দিয়েছিল একবার আমার গান শুনে। সেটাও বোধহয় আছে। কিন্তু ওগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রে ভাই। সন্ন্যাসী-বৈরাগী মানুষ আমি, ওসব দিয়ে কী-ই বা হবে। তবে হিমালয়ে থাকতে একবার খাড়াবাবার ডাক এল মানস-সরোবর থেকে। গিয়ে পড়তেই খাড়াবাবা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, 'ওরে পঞ্চা, আমি হলাম গিয়ে খাড়া-সন্ন্যাসী, বসা বা শোওয়ার জো নেই, দিনরাত একঠ্যাং বা দু'ঠ্যাঙে ভর করে খাড়া হয়ে সাধন-ভজন করতে হয়। কিন্তু একটা বেওকুফ ভূত এসে সারাক্ষণ আমার ঠ্যাং ধরে টানাটানি করে, পায়ে সুড়সুড়ি দেয়, হাঁটুতে গুঁতোয়। একটা ব্যবস্থা কর বাবা।' তা তখন মন্ত্র পড়ে চারদিকে বন্ধন দিয়ে নিয়ে ঘণ্টা-খানেকের চেষ্টায় একটা পলো দিয়ে তো ভূতটাকে পাকড়াও করলাম। ভারী নচ্ছার ভূত, ছাড়া পেলেই চারদিকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে বেড়াবে। তাই একটা কৌটোয় ভরে পুঁটুলিতে রেখে দিয়েছি।"

রাঁধুনি আঁতকে উঠে বলল, "ও বাবা!"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "ভয়ের কিছু নেই, আমি তো আছিই। তবে পুঁটুলিটা হুট করে খুলেটুলে ফেলো না। নাড়াচাড়ায় কৌটোর ভূত যদি জেগে যায়, আর বোঝে যে আনাড়ির হাতে পড়েছে, তা হলেই কিন্তু কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে।"

রাঁধুনি মাথা চুলকে বলল, "পুঁটুলিটা বরং আপনার কাছেই থাক। আমি বরং দইটা নিয়ে আসছি।"

বলে রাঁধুনি পালাল।

খাওয়াটা মন্দ হল না পঞ্চানন্দর। ঢেকুর তুলে তৃপ্ত মুখে উঠে সে আঁচিয়ে নিল। তারপর গিয়ে জরিবাবুর ঘরে ঢুকল।

জরিবাবু কলেজে পড়ান। এ-সময়টায় ঘরে থাকেন না। পঞ্চানন্দ নিজেই একখানা পান সেজে মুখে দিল। তারপর শুয়ে একটু গড়াল।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন জরিবাবু ফিরেছেন এবং সন্তর্পণে জামাকাপড় পালটাচ্ছেন। তাকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "ইশ্, আপনার ঘুমটা বোধহয় ভেঙে দিলাম।"

পঞ্চানন্দ অবাক হয়ে বলল, "ঘুম! ঘুমটা কোথায় দেখলেন? গত তেইশ বছর আমার ঘুম কেউ দ্যাখেনি। ঘুমের মতো যা দ্যাখেন, তা হল যোগনিদ্রা। মনটাকে কূটস্থে ফেলে ধ্যান করতে করতে সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে পড়ি আর কি! কখনও বিলেত ঘুরে আসি, কখনও উত্তর-মেরু চলে যাই, যখন যেখানে প্রয়োজন মনে হয়। চাঁদে তো হামেশাই যেতে হয়। মঙ্গলগ্রহে, শুক্রে, বৃহস্পতিতে, কোথায় ডাক না পড়ে বলুন।"

জরিবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আপনার যে নাক ডাকছিল।"

পঞ্চানন্দ খুব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, "মুশকিল কী জানেন ? দেহ ছেড়ে আমি যখন বেরিয়ে পড়ি, তখন দেহটা একেবারে মড়ার মতো হয়ে যায়। শ্বাস চলে না, নাড়ি থেমে যায়। লোকে ভাবে, সত্যিই বুঝি পঞ্চানন্দ পটল তুলেছে। একবার তো কাশীতে ওই অবস্থায় আমাকে মড়া ভেবে দাহ করতে মণিকর্ণিকায় নিয়েও গিয়েছিল। ভাগ্যিস সময়মতো নেবুলাটা চক্কর মেরে ফিরে এসেছিলাম। নইলে হয়ে যেত। শরীর গেলে ভারী অসুবিধে। সেই থেকে করি কী, সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে পড়ার আগে নাকটাকে চালু রেখে যাই। ওটা ডাকলে আর কেউ মরা মানুষ বলে ভাববে না।"

জরিবাবুর খুবই কষ্ট হচ্ছিল বিশ্বাস করতে। কয়েকবার ঢোক গিললেন, ঠোঁট কামড়ালেন, গলাখাঁকারি দিলেন। তারপর বললেন, "তা ভাল, বেশ ভাল।"

পঞ্চানন্দ একটা হাই তুলে বলল, "তা আজও একটা চক্কর মেরে এলুম।"

জরিবাবু এত অবাক হয়েছেন যে, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। খানিক বাদে ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে ?"

পঞ্চানন্দ আড়মোড়া ভেঙে বলল, "বেশি দূরে যেতে হল না। ভেবেছিলুম, একেবারে ব্রহ্মলোকের সাত নম্বর সিঁড়িতে গিয়ে শিবুবাবুকে ধরব।"

"সাত নম্বর সিঁড়ি ?"

পঞ্চানন্দ খুবই উচ্চাঙ্গের একখানা হাসি হেসে বলল, "শিবুবাবু একেবারে ব্রহ্মলোকের দোরগোড়াতেই পৌঁছে গেছেন বলা যায়। আর সাত ধাপ উঠলেই সাক্ষাৎ-ব্রহ্মলোক। তবে কিনা যত কাছাকাছি হবেন ততই ওঠা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। শুনতে সাত ধাপ বটে, কিন্তু ওই সাত ধাপ পেরোতেই হয়তো লাখ লাখ বছরের তপস্যা লেগে যাবে। তবে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠেছেন অনেকটা। তা ভাবলাম সেখানেই চলে যাই। জায়গাটা বেশ সাফসুতরো, নির্জন, সিঁড়ির ধাপে বসে দুটো সুখদুঃখের কথাও কয়ে আসি আর বাড়ির সব খবর-টবরও দিয়ে আসি। শুনে শিবুবাবু খুশি হবেন। তা অতদূর আর যেতে হল না। কৈলাসটা পেরোতে দেখি, শিবুবাবু নিজেই হন্তদন্ত হয়ে নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই বললেন, ওরে পঞ্চা, আমার বাড়িতে গিয়েছিস সে খবর পেয়েছি। বলি ওরা তোকে খাতিরযত্ন ঠিকমতো করছে তো ! খাওয়া-শোওয়ার কোনও অসুবিধে নেই তো ! এই শীতে গায়েই বা দিচ্ছিস কী ?"

জরিবাবু চোখ গোল করে তাকিয়ে রইলেন।

পঞ্চানন্দ আড়চোখে ভাবখানা লক্ষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "আমি আর কী বলি ! বললুম, ভালই আছি। কিছু-কিছু অসুবিধে সে তো হতেই পারে। তখন শিবুবাবু ভারী দুঃখ করে বললেন, ওরে পঞ্চা, আমার বড় ছেলেটাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছি, মেজোটাও বোধহয় মানুষ হল না, সেজোটা পুলিশে ঢুকে গোল্লায় গেছে, ছোটটা তো গবেট। তা তুই যখন গিয়ে পড়েছিস সেখানে, আমার ছেলেগুলোকে একটু দেখিস বাবা।"

জরিবাবু কী একটা বলবেন বলে হাঁ করেছিলেন, কিন্তু স্বর ফুটল না।

পঞ্চানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "পরের বেগার খেটে-খেটে পঞ্চানন্দর আর নিজের জন্য কিছু করা হয়ে উঠল না, দুনিয়াটার নিয়মই এই। তা চায়ের ব্যবস্থাটা এ-বাড়িতে কীরকম বলুন তো জরিবাবু ? পাঁচটা বাজতে চলল যে ! এরপর চা খাওয়া যে শাস্ত্রে বারণ।"

জরিবাবু শশব্যস্তে বললেন, "দাঁড়ান দেখছি।"

পঞ্চানন্দ মোলায়েম স্বরে বলল, "খালি পেটে চা খাওয়াটা কিন্তু মোটেই কাজের কথা নয়। গোটাকতক ডিমভাজা আর মাখন-টোস্টেরও ব্যবস্থা করে আসবেন।"

জরিবাবুর ব্যবস্থায় চা এল, টোস্ট আর ডিমভাজাও এল। পঞ্চানন্দ খেয়েদেয়ে উঠে ঢেকুর তুলে বলল, "এবার একখানা পান লাগান।"

পান চিবোতে-চিবোতে পঞ্চানন্দ যখন জরিবাবুকে ছেড়ে হরিবাবুর সন্ধানে দোতলায় এল, তখন হরিবাবুর বাহ্যজ্ঞান নেই। টেবিলে স্তূপাকৃতি খাম, পোস্টকার্ড আর ইনল্যাণ্ড। তিনি পোস্টকার্ডের পর পোস্টকার্ডে কবিতা লিখে চলেছেন।

পঞ্চানন্দ একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আজ্ঞে কাজ তো বেশ এগোচ্ছে দেখছি।"

হরিবাবু মুখ তুলে খুব পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "অফিসের পথেই ডাকঘর। নিজেই পঞ্চাশ টাকার কিনে আনলাম। আইডিয়াটা বেশ ভালই হে।"

পঞ্চানন্দ একটু চাপা গলায় বলল, "এসব কাজ করার সময় দরজাটা এঁটে নেবেন ভালমতন। গিন্নি-মা যদি দেখে ফেলেন তবে কিন্তু কুরুক্ষেত্তর হবে।"

"তা বটে, ওটা আমার খেয়াল হয়নি। আচ্ছা পঞ্চানন্দ, এই ধরো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীকে যদি চিঠিতে কবিতা পাঠাই, তবে কেমন হয় ?"

"সে তো খুবই ভাল প্রস্তাব। তাঁদের হাতেই তো সব কলকাঠি। কবিতা পড়ে যদি কাত হয়ে পড়েন তো আপনার কপাল খুলে গেল। সভাকবি-টবিও করে ফেলতে পারেন।"

"দূর ! সভাকবি আজকাল আর কেউ হয় না।"

"নিদেন দরবারে তো ডাক পড়তে পারে। চাই কি নোবেল প্রাইজের খাতায় আপনার নাম তুলবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যাবেন তিনজনে।"

হরিবাবু একটু ব্যথিত হয়ে বললেন, "নোবেল প্রাইজের কথা থাক। এ-দেশের সম্পাদকরাই আমার কবিতা ছাপল না, তো নোবেল প্রাইজ। তবে আমি ঠিক করেছি নিজের খরচে একখানা কবিতার বই ছেপে বের করব।"

"সে তো হেসে-খেলে হবে। টাকাটা ফেলে নিশ্চিন্তে কবিতা লিখে যান, ছাপাখানা থেকে দফতরির বাড়ি দৌড়োদৌড়ি যা করার আমিই করব। তা আজ এক-আধখানা কবিতা নামিয়েছেন তো ! একখানা ছাড়ুন, শুনি।"

"শুনবে !" বলে একটু লজ্জার হাসি হাসলেন হরিবাবু। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন :

কবিতা কখনও ক্ষমা করে না কবিরে।
ক্ষমা পায় হত [illegible] লভে চোর,
ডাকাত, মস্তান আর য [illegible] খোর—
সিক্ত হয় ক্ষমারূপ বৃষ্টিবারিধারে।
কবির বাগানে নাচে প্রেত, ডাকে তারে
মরীচিকা। তা-ই কাব্য, যমের দোসর।
কবিরে শোষণ করে. [illegible] দেয় গোর।
কবিতা কখ [illegible] র না কবিরে।

(ক্রমশ)

তার মানে ? ঢুকতে দেবেন না ?
না । ওই বিমানে উঠে ফিরে যান।
চালাকি পেয়েছেন ? আমাদের এ-দেশে ঢুকতে দিতে আপনারা বাধ্য ।
ওরে, এদের ওই বিমানে তুলে দে তো !
এতদূর এসে ফিরে যেতে হচ্ছে ! কী নচ্ছার লোক এরা ! এ তো ভাবাই যায় না !
এক ঘণ্টা বাদে...
ঘণ্টাখানেক বাদে ওদের ওই বিমান যখন পাহাড়ের উপর দিয়ে যাবে...হাহা...
প্লেন তো নয়, গোরুর গাড়ি ! কী ঝাঁকুনি রে বাবা ! এ-রকম ঘটবে, ভাবতেই পারিনি ! কপালে যে এর পর কী আছে, কে জানে !
বাক্সটা শেষপর্যন্ত আমার মাথাতেই পড়ল !
হুঁশিয়ার ক্যাপ্টেন !
বাবা রে...
...এয়ার-পকেট !
লাগেনি তো ক্যাপ্টেন ?
না, না, লাগবে কেন ! দিব্যি মজায় আছি
টিক
টিক
টিক
টিক
টিক

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

রোভার্সের গোপন শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল

রোভার্সের গোপন শত্রু বুঝতে পারছে না যে, একমাত্র প্যাকো বাদে সবাই কী করে সুস্থ রইল। সকলেরই তো অসুস্থ হয়ে পড়বার কথা। তা হলে ?

রোভার্সের খেলোয়াড়রা কী করছে দ্যাখো !

জারকাদিকে একেবারে নাচিয়ে ছাড়ছে !

ডিমু বল পেয়েছে !

এগিয়ে যাও জর্জি !

জর্জি ডিমু দুর্দান্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে···

কী রকম কাটাচ্ছে দ্যাখো ! শাবাশ !

আটকাও !

হঠাৎ···

উঃ !

ফাউল !

খেলা চালাও !

অ্যাডভান্টেজ রুল···

রয় বল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে···

দুর্দান্ত লব !

টু নিল

রোভার্সের গোপন শত্রু হতভম্ব···

সকলেরই তো অসুস্থ হয়ে পড়া উচিত ! ব্যাপার কী ?

প্যাকো ডিয়াজ সুস্থ হয়ে খেলছে···

ডিয়াজকে বল দাও !

হুঁশিয়ার জারকাদি

প্যাকো দিল লিঞ্চকে !
ধরো লিঞ্চ !
জুনিয়ার খেলোয়াড় বল পেয়েছে !
গো-ও-ও-ল
স্রেফ পা বাঁকিয়ে দিল !
ছেলেটা তৈরি হয়ে উঠছে !
বিরতির সময় তুমুল অভিনন্দন...
দলে এত জখম, তবু দুর্দান্ত খেলছে !
শাবাশ !
নিকোস কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে এসেছে !
আপনাদের সেবা করতে পেরে আমি ধন্য !
কিন্তু বোতলে করে কী এনেছ ?
হোটেলের পরিচারক নিকোস...
এ হল মিনারেল ওয়াটার । খেলেই চনমনে হয়ে উঠবেন !
শাবাশ !
ও-জল খেয়ো না !
সে কী !
অ্যাঁ ?
রয়ের কথা শুনে সবাই তো অবাক !
এ-জলে কিছু মেশানো হয়েছে !
কী বলছেন আপনি ?
বলছি এই যে, বারবার তুমি আমাদের বিপদে ফেলতে চাইছ !
হুম্, এই ব্যাপার !
অর্থাৎ এই নিকোসটি হচ্ছে...
বন্ধুবেশে আমাদের মস্ত শত্রু !
গোপন শত্রু ধরা পড়েছে ! এবারে তার শাস্তি হবে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

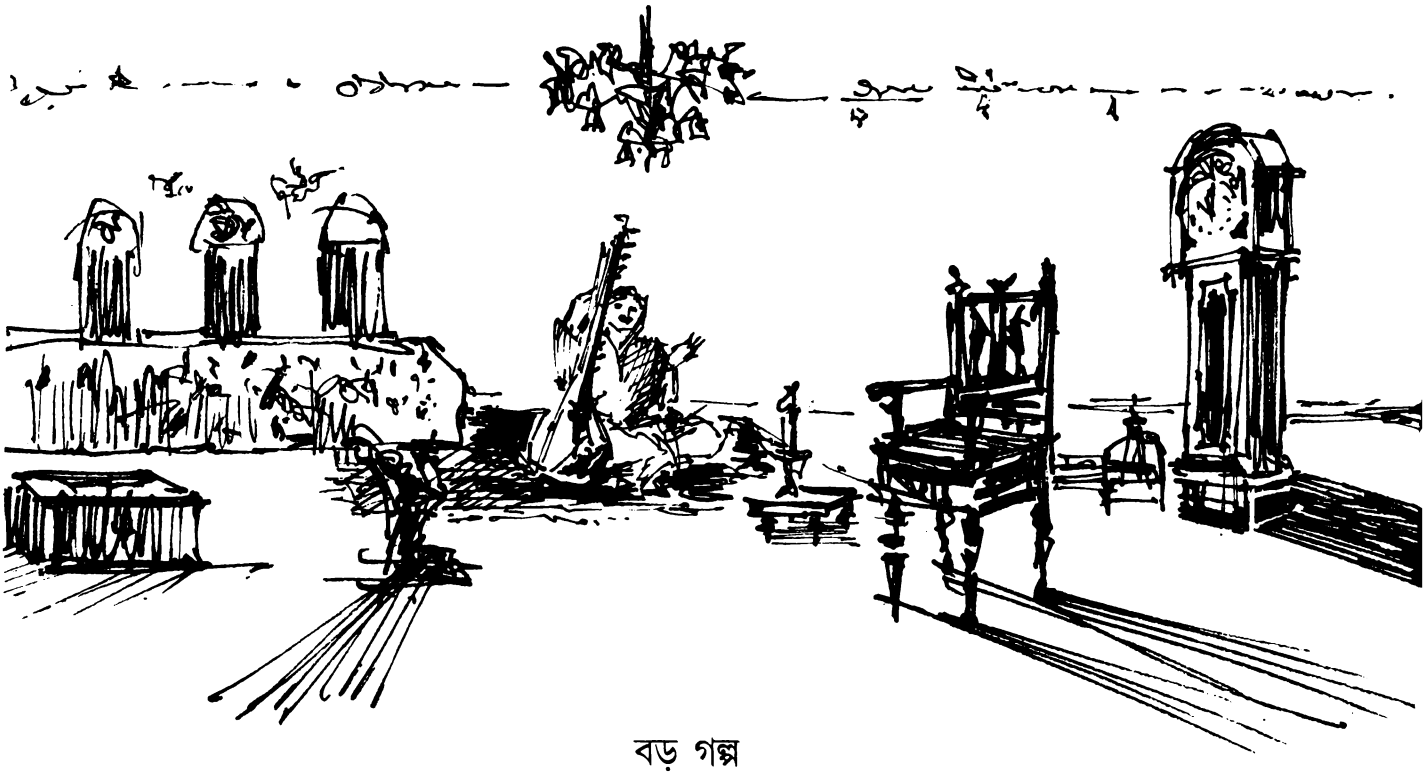

বড় গল্প

ভূত দেখানো

অজেয় রায়

গ্রামের পুবপাড়া ছাড়িয়েই নটবর বলল, "ওই দেখুন মজুমদার-বাড়ি।"

মহেন্দ্র চৌধুরী দেখলেন— শ'তিনেক গজ দূরে খোলা মাঠের মাঝে উঁচু পাঁচিল ঘেরা এক অট্টালিকা। বাড়ির কম্পাউণ্ডে বড়-বড় গাছ। গ্রাম থেকে মেঠো রাস্তাটা গিয়ে পৌঁছেছে বাড়ির প্রধান ফটকের মুখ অবধি। বাড়ির পিছনে দিগন্তে মেশা চাষের খেত, রুক্ষ বৈশাখে এবড়ো-খেবড়ো ধু-ধু জমি।

থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে চৌধুরী বললেন, "হুম্। চলো।"

দুজনে বাড়িটার দিকে এগোয়।

প্রকাণ্ড লোহার গেটটা হাট করে খোলা। ফটকের দুধারে কারুকার্য-করা থামের মাথায় হতশ্রী রঙচটা দুই সিংহমূর্তি। চৌধুরীমশাইসহ নটবর গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকে।

মেন গেট থেকে বাড়ি অবধি চওড়া পথটা এখন ঘাস ও আগাছায় ভর্তি। একদা জুড়িগাড়ি হাঁকানো পথের চিহ্ন বলতে রয়েছে শুধু রাস্তার ধারে ধারে কয়েকটি সুদৃশ্য পাম ও পাতাবাহার গাছ। বাগানে আম, লিচু, বুনোজাম, নিম ইত্যাদি নানান গাছের মেশামেশি। বড় গাছের তলায় কোথাও ঝোপঝাড়। তারই মাঝে কয়েকটি বাঁধানো বেদি। এসবই এ-বাড়ির অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের সাক্ষ্য।

মহেন্দ্র চৌধুরীর অবশ্য এত খুঁটিয়ে দেখার মন ছিল না। তাঁর চোখ আটকে ছিল সামনের অট্টালিকার দিকে। দোতলা বাড়ি। লালচে রঙ। এখন কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বাড়ির ডান ধারে প্রকাণ্ড এক বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দুজন। দরজায় মস্ত তালা মারা।

নটবর বলল, "এইটে সদর দরজা। ঘোড়া, পালকি সব ঢুকে যাবে। আপনি দাঁড়ান এখানে। আমি চাবি নিয়ে আসচি।" সে ঘুরে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল নটবর। লম্বা একটা চাবি ঢুকিয়ে খুলল সদর। ঢুকল ভিতরে। সামান্য এগিয়েই দুজনে দাঁড়াল বিশাল এক চত্বরের মুখে। চৌকো বাঁধানো উঠোন ঘিরে ছাদ ঢাকা চওড়া উঁচু বারান্দা। গোল মোটা-মোটা থাম। বারান্দার পিছনে ঘরের সারি। চত্বর থেকে সিঁড়ির ধাপ উঠেছে বারান্দায়। দোতলাতেও ঘরের পর ঘর এবং তাদের সামনে দিয়ে বারান্দা। একতলায় একধারে ঠাকুরদালান। সব ঘরই বন্ধ।

ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখেন মহেন্দ্র চৌধুরী। একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগে। মনে হল, এই জনমানবহীন খাঁ-খাঁ পুরীতে যেন তাঁরা অনধিকার প্রবেশ করেছেন। এখানে বুঝি স্বাভাবিক মানুষের স্থান নেই। নটবর বলল, "চলুন ঘুরে দেখে আসা যাক।"

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে একতলার বারান্দায় ওঠে। মেঝেতে পুরু ধুলো ও পাখির ময়লা। ছাদে মাকড়সার জাল।

সার সার তালা বন্ধ দরজা। খড়খড়ি লাগানো জানলাগুলো আঁটা। কার্নিসে ঘুলঘুলিতে প্রচুর পায়রার নিশ্চিন্ত বাস।

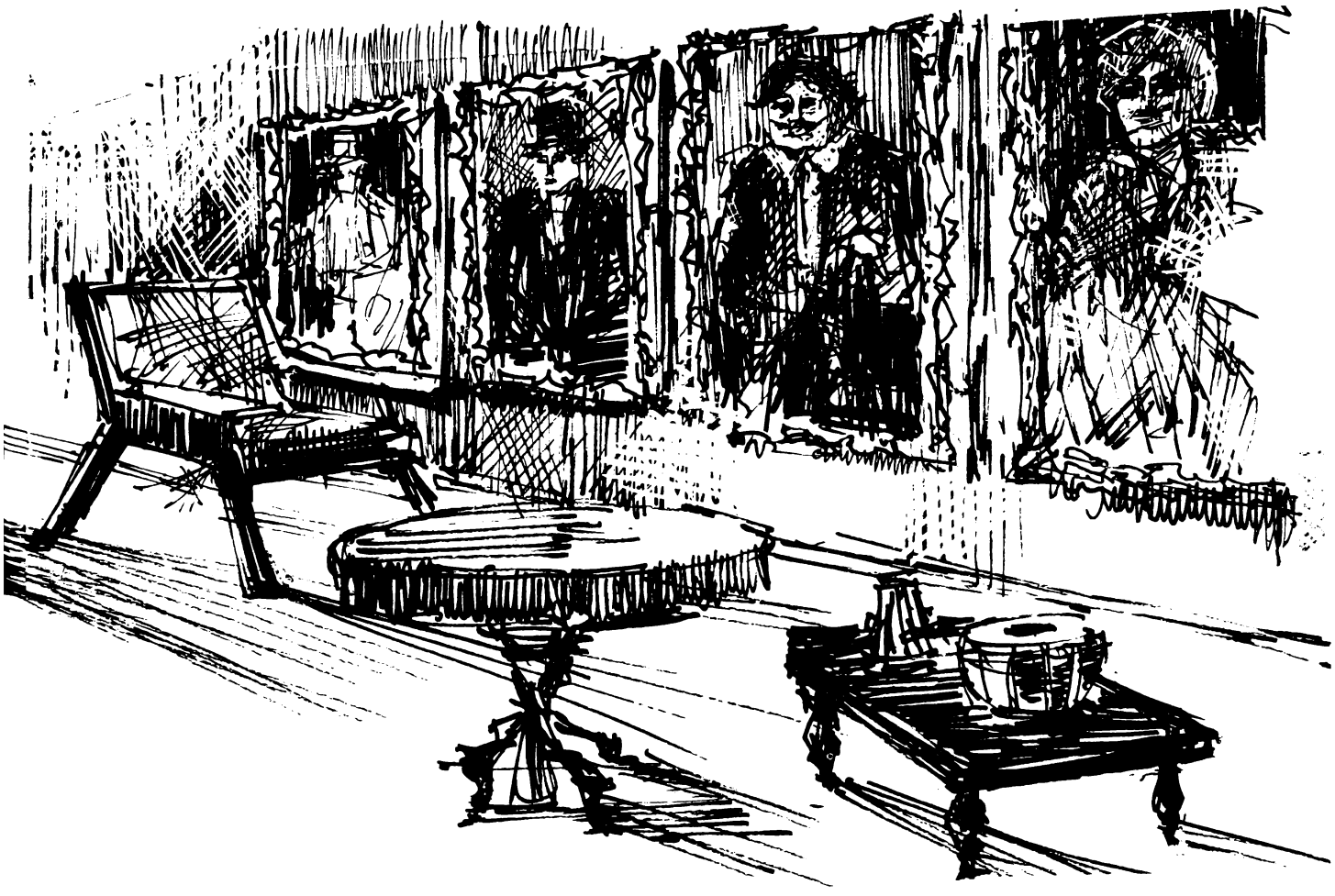

নিঝুম পুরীতে মাঝে মাঝে শুধু তাদেরই যা মৃদু বকবকম ধ্বনি এবং ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। দুজনের জুতোর খটখট মশমশ শব্দ নিজেদের কানেই কেমন বেখাপ্পা ঠেকে।

নটবর বলল, "দেখছেন স্যার কী মজবুত বাড়ি! কী সব কড়িবরগা— খাঁটি শাল-সেগুনের! থামের গায়ে এ অর্ডিনারি হোয়াইটওয়াশ নয়। পঙ্খের কাজ! এখনও কেমন ধবধবে সাদা, জেল্লা দিচ্ছে। পঙ্খ জানেন তো স্যার? ঝিনুক গুঁড়িয়ে তৈরি ভেরি ফাইন চুন। খুব দামি। খানদানি ব্যাপার। তবে এখন ভাল দেখাশুনা হয় না বাড়ির। তাই দেখুন না, বট অশথের চারা গজিয়েছে ফোকরে।"

"কদ্দিনের বাড়ি এটা?" জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী।

"তা শ'খানেক বছরের বেশি তো হবেই," উত্তর দিল নটবর।

চৌধুরীমশাই ঠাকুরদালানের সামনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর কল্পনায় ভাসে, একদা এখানে প্রতিমা বসত, পুজো হত। তখন এই শূন্য উঠোনে কত ভিড়। ঢাকঢোল কাঁসর-ঘণ্টার গমগমে আওয়াজ। অলিন্দে, মুক্ত বাতায়নে, কত উৎসুক চোখ কত ব্যস্ত মানুষের ঘোরাফেরা হাঁকাহাঁকি।

"এ বাড়ি এমন ফাঁকা পড়ে আছে কতদিন?" প্রশ্ন করলেন চৌধুরী।

"বছর দশেক," নটবর জানাল, "তার আগে মজুমদারদের এক ফ্যামিলি থাকত এখানে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে এ বাড়িতে। তার কিছুদিন বাদেই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় পরিবারটি। মানে বলতে পারেন পালিয়ে যায়, টিকতে না পেরে।"

"কেন?"

"ওই কীসব ভুতুড়ে উপদ্রব। আর কেউ থাকতে আসেনি। কে আর আসবে? জমিজায়গা তো নেই। কেবল মাত্র এই বাড়িখানা। এর গাদা ওয়ারিস। সবাই থাকে দূরে দূরে। কারও ইন্টারেস্ট নেই এ বাড়িতে। তার ওপর ভুতুড়ে বদনাম।"

"হুম্।" মাথা ঝাঁকালেন মহেন্দ্র চৌধুরী।

নীচের তলায় একপাক দিয়ে চাবি বের করে একটা দরজা খুলল নটবর। সে ভিতরে ঢুকল, পিছু পিছু চৌধুরী। "এইটে অন্দরমহল," জানাল নটবর।

একইরকম চৌকো বাঁধানো উঠোন, তবে আকারে কিঞ্চিৎ ছোট। একই প্যাটার্নে একতলায় ও দোতলায় ঘর-বারান্দা, থামের সারি। তবে ঠাকুরদালান নেই। উঠোনের মধ্যিখানে একটা কুয়ো। এখানেও পায়রার রাজত্ব এই মহলটা নোংরা বেশি। ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে।

"উঠবেন নাকি দোতলায়?" বলল নটবর।

উপর-নীচ দেখে নিয়ে চৌধুরী জানালেন, "নাঃ থাক।" তিনি বাড়িটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "এখানে সত্যি কিছু দেখা-টেখা যাবে কি? মানে ভূত-টুত?"

"যাবে স্যার, যাবে। দেখাও যাবে। শোনাও যাবে," বলল নটবর, "আমি খোঁজ-খপর নিয়েই এসেছি। হারুকে জিজ্ঞেস করবেন। ও রাতে কক্ষনো ঢোকে না এ বাড়িতে।"

"হারু কে ?" জানতে চাইলেন চৌধুরী।

"এ বাড়িতে চাকরি করত একসময়। এখন বাড়িটা দেখাশুনা করে। দেখাশুনা বলতে, দরজা-জানালাগুলো কেউ খুলে না নিয়ে যায় বা ফার্নিচারগুলো কেউ চুরি না করে, এইটুকু। মাইনে-টাইনে পায় না। তবে গাছের ফল ভোগ করে আর পুকুরের মাছ। বাড়ির চাবি ওর কাছেই থাকে।"

একটা কথা মনে পড়ে যেতে চৌধুরী বললেন, "তেমন ডেন্‌জারাস্ কিছু ঘটে না তো ? হারু কী বলে ?"

"না না, সেরকম কিছু নয়। আমি খবর নিয়েচি। তবে স্যার বেশি নার্ভাস হলে মুশকিল। নার্ভ ঠিক রাখবেন। দেখবেন কিস্‌সু হবে না। আর একটা কথা। তেনাদের ডিসটার্ব করা চলবে না। তাহলে সত্যি-সত্যি বিপদ হতে পারে। চুপচাপ দেখে যাবেন। নো ডেন্‌জার।"

মহেন্দ্র চৌধুরী তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললেন, "নার্ভ আমার ঠিক আছে। তা কবে আসব ?"

"যে-কোনও দিনই আসা যায়।" বলল নটবর, "তবে তিনদিন্ বাদে শনিবার অমাবস্যা। ওই রাতটাই ভাল। শুনলাম, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় প্রায় শিওর সাকসেস। কিছু না কিছু ঘটেই।"

"বেশ তাই হোক।" চোধুরী রাজি।

দুজনে আবার বাইরের মহলে ফিরলেন। নটবর বলল, "জলসাঘরটা একবার দেখে যান স্যার। দেখবার মতন বটে।"

চাবি লাগিয়ে একটা দরজার তালা খুলল নটবর। ক্যাঁচ্। প্রকাণ্ড কবাটদুটো হাতের ঠেলায় ক্ষীণ প্রতিবাদে পথ করে দিল।

আধো অন্ধকার বিশাল কক্ষ। নটবর ওপাশের একটা জানলা হাট করে খুলে দিল। ঘর ভরে ওঠে দুপুরের উজ্জ্বল রোদে। চমকে যাওয়া এক চামচিকে কয়েক চক্কর উড়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। চৌধুরী ঘরে ঢুকলেন।

প্রথমেই নজরে পড়ল ডান দিকের দেয়ালে উঁচুতে ঝোলানো কতগুলি বড়-বড় প্রতিকৃতি। নানা বয়সী কয়েকজন পুরুষের ছবি। অয়েলপেন্টিং। চকচকে ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিতে কেউ ঘোড়ার পিঠে কেউ সিংহাসনজাতীয় চেয়ারে বসা। কেউ বাজাচ্ছেন এস্রাজ। কারও হাতে তানপুরা— গান গাইছেন। সবারই চেহারায় বেশ মিল। তবে তাঁদের পোশাক রকমারি—চোগা- চাপকান, ধুতি-পাঞ্জাবি, কোট-প্যান্ট, পাগড়ি, টুপি, হ্যাট ইত্যাদি।

নটবর বলল, "মজুমদার ফ্যামিলির কর্তাদের ছবি স্যার।"

পোর্ট্রেটগুলির একদম শেষে দেয়ালে ঝুলছে একখানি বাঁধানো ফোটোগ্রাফ—। ছয়-সাত বছরের এক শিশুর ফোটো। চৌধুরী ফোটোটা দেখিয়ে অবাক হয়ে বললেন, "এটা এখানে কেন ?"

নটবর বলল, "এটা সেই বাচ্চা ছেলেটার ছবি। তখন বললাম না স্যার, বছর-দশ আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল এই বাড়িতে। এই বাচ্চাটি মারা যায় দোতলা থেকে পড়ে। খুব দুরন্ত ছিল। সেই শোকে ওর দাদু উন্মাদ হয়ে যান। মারাও যান কয়েক মাস বাদে। তারপর থেকেই এখানে নানারকম ভুতুড়ে কাণ্ডের শুরু। হারুর কাছে শুনেছি এসব।"

ঘরের একধারে গায়ে গায়ে লাগোয়া দুটো বিরাট তক্তপোশ। তাদের ওপর জীর্ণ কার্পেট পাতা। ধুলোমাখা ছিন্ন-তার একটি তানপুরা রয়েছে কার্পেটের ওপর।

ঘরে আরও কয়েকটি আসবাব। দুটি ভারী কাঠের চেয়ার। একটি মস্ত আরামকেদারা। একটি শ্বেতপাথর-বসানো গোল টেবিল। চেয়ার ও আরামকেদারার বেতের বুনন ছেঁড়া। আর নজরে পড়ার মতো জিনিস হল প্রকাণ্ড এক দেয়ালঘড়ি। এবং ছাদ থেকে ঝুলন্ত ঝাড়লণ্ঠন। ঘড়িটির পেণ্ডুলাম এখন স্তব্ধ।

নটবর বলল, "এটা ছিল বৈঠকখানা আর জলসাঘর। খুব গানবাজনার আসর বসত এককালে। মজুমদারদের অনেকেই গান-বাজনায় ওস্তাদ ছিলেন।"

জলসাঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে নটবর বলল, "বাড়ির পিছনদিকটা একবার দেখবেন নাকি ? পুকুর আছে, মস্ত বড়। অনেক নারকেল গাছ। হারু থাকে ওখানে।"

পুকুরপাড়ে হারুর ছোট্ট কুটির। স্ত্রীকে নিয়ে থাকে হারু। বৃদ্ধ হারু এসে নমস্কার করল চৌধুরীমশাইকে। লোকটি অতি গোবেচারা। শহুরে প্যান্ট-শার্ট পরা বাবু দেখে ঘাবড়ে গিয়ে মুখে তার কথাই ফুটল না।

এরপর কলকাতায় ফেরা। আগামী শনিবারে আসার প্রোগ্রাম স্থির করে হাওড়া স্টেশন থেকে বিদায় নিল নটবর।

মহেন্দ্র চৌধুরীর এই উদ্ভট শখ কেন ? কারণটা জানতে হলে আমাদের মাস-চারেক পেছিয়ে যেতে হবে।

মহেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন এক কোম্পানির বড়কর্তা। দুবছর হল রিটায়ার করেছেন। একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কলকাতায় গড়িয়াহাটে নিজের ফ্ল্যাটে থাকেন, ঝাড়াঝাপটা স্বামী-স্ত্রী। ছোট ভাই পিনাকী চৌধুরী নামকরা উকিল।

অবসর নেওয়ার পর ক্লাব, সেবাসমিতি, আড্ডা ইত্যাদি নিয়ে মহেন্দ্রবাবুর সময় কেটে যাচ্ছিল দিব্যি। গণ্ডগোল-বাধল মার্টিনসাহেব এসে।

মহেন্দ্র চৌধুরী বছর-পনেরো আগে একবার বিলেত গিয়েছিলেন আপিসের কাজে। দু-হপ্তার জন্যে। তখন জন টার্নবুলের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়। তাঁদের কোম্পানির লণ্ডন অফিসে মাঝারি অফিসার ছিল টার্নবুল। মহেন্দ্রবাবুকে খুব খাতিরযত্ন করেছিল টার্নবুল। নিজে সঙ্গে নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরিয়েছিল। দেশে ফিরে আসার পরেও টার্নবুলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটা নষ্ট হয়নি। চিঠিপত্র চলে। ক্রিস্‌মাসে কার্ড আদানপ্রদান হয় প্রতি বছরই। অবশ্য দেখা আর হয়নি। সেই টার্নবুলের চিঠি পেলেন চার মাস আগে। লিখেছে—টার্নবুলের ভায়রাভাই টনি মার্টিন যাচ্ছে ইণ্ডিয়া দেখতে। ক্যালকাটাতেও যাবে। ওকে যদি একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন মিস্টার চৌধুরী, টার্নবুল কৃতজ্ঞ থাকবে।

মার্টিনকে দেখে মহেন্দ্রবাবু একটু হতাশ হলেন। টার্নবুল ছিল স্যুট-বুট-টাই-হ্যাটে পাক্কা সাহেব। কিন্তু বছর পঁয়তাল্লিশের ঢ্যাঙা মার্টিনের পোশাকে ছিরিছাঁদ নেই। পরনে রঙচঙে শার্ট, নীল জিনসের ট্রাউজার্স, চওড়া বেল্ট, কেডস্ জুতো। টুপি নেই। একমাথা সোনালি এলোমেলো চুল। চিবুকে একগুচ্ছ দাড়ি। ছটফটে। লোকটি নাকি বেজায় ধনী। আমেরিকায় কেক-বিস্কুটের ব্যবসা আছে।

দুদিন ধরে মার্টিনকে কলকাতা দেখালেন মহেন্দ্রবাবু। পুরনো জিনিস, পুরনো বাড়িঘর মূর্তি দেখতেই মার্টিনের উৎসাহ বেশি। মার্টিনের আগ্রহের ফলেই মহেন্দ্রবাবু তাকে

নিয়ে গেলেন তাঁদের দেশের বাড়িতে। বর্ধমান জেলার এক গ্রামে।

চৌধুরীদের দেশের বাড়িটা মস্ত বড়। দোতলা। যথেষ্ট পুরনো। বাড়িটা এখন প্রায় ফাঁকা। মাত্র একটি পরিবার থাকে নীচের তলায়। দুর্গাপুজোর সময় যা একটু লোকজন হয় বাড়িতে। চৌধুরীবংশের কেউ-কেউ তখন দেশে আসেন। সংস্কারের অভাবে বাড়িটার এখন রঙ চটেছে, দেয়ালে অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসেছে।

বাড়িখানা দেখে মার্টিন মহা খুশি। ঘুরেফিরে দেখল সে। তারপর সন্ধ্যায় গ্রাম যখন নিঝুম হয়ে গেছে তখন মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা চাউড্রি, তোমাদের বাড়িতে গোস্ট নেই ?"

নাকি সুরের আমেরিকান ইংরিজি মহেন্দ্রবাবু প্রথমে ধরতে পারেননি। বললেন, "পার্ডন ?" অর্থাৎ কী বললে ?

মার্টিন একই কথা বলতে তিনি চমকে উঠলেন।

গোস্ট। মানে ভূত ! চৌধুরীবাড়ি পুরনো হতে পারে, তা বলে ভূত ? নাঃ, ভূত-ফুতের বদনাম নেই। তিনি মাথা নাড়লেন— "নো।"

মার্টিন বিষণ্ণভাবে বলল, "বুঝলে চাউড্রি, আমার এখানে এই ইচ্ছেটা আর পূরণ হল না। ভারী আশা করে এসেছিলাম। ইণ্ডিয়া এত এন্‌শেণ্ট সিভিলাইজেশন। কত পুরনো বাড়িঘর এদেশে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এখানে কোনও হণ্টেড-হাউসে আমি নিজের চোখে ভূত দেখব। সুপারন্যাচারালে আমার বড্ড ইন্‌টারেস্ট। ইংল্যাণ্ডে একটা পুরনো ক্যাসলে কাটিয়েছিলাম দু রাত। অদ্ভুত হাসি শুনেছি। তবে দেখতে পাইনি কিছু। নিজের চোখে একবার অন্তত ভূত দেখতে আমার ভীষণ সাধ। এই যে ইণ্ডিয়াতে দশদিন ধরে ঘুরলাম, কত প্রাচীন মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গের লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি এখানে গোস্ট দেখতে পাব কি ? কেউ ভেবেছে ঠাট্টা। কেউ চটে গেছে। ভূত দেখা আমার ভাগ্যে হয়নি। দেখি, এরপর একবার মিশরে গিয়ে ট্রাই করব। ওটিও খুব প্রাচীন জায়গা। শুনেছি, পুরনো জায়গায় পুরনো বাড়িতেই নাকি ভূত থাকে।"

শুনে মহেন্দ্র চৌধুরী থ।

কত ভুতুড়ে বাড়ির গল্প তো কানে আসে। কিন্তু ফট করে চাইলে ভূত দেখানোর ব্যবস্থা কী ভাবে করা যায় তাঁর মাথায় এল না। আর খোঁজখবরের সময়ও নেই। পরশুর ফ্লাইটে মার্টিন ফিরে যাবে আমেরিকায়। সাহেবের কথা তাঁর মনে ঘা দিল। খানিক গুম হয়ে থেকে বললেন, "তুমি আবার কবে এদেশে আসতে পারবে ?"

মার্টিন বলল, "পাঁচ-ছয় মাস বাদে আবার ট্যুরে বেরোবার ইচ্ছে আছে। তখন আসতে পারি।"

"বেশ, আমি চেষ্টা করব তখন তোমায় হণ্টেড হাউসে গোস্ট দেখাতে। সন্ধান পেলেই চিঠি লিখে জানাব। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট।"

"থ্যাংকু, থ্যাংকু," বলে মার্টিন চেপে ধরে মহেন্দ্রবাবুর হাত।

মহেন্দ্রবাবুর ভুতুড়ে বাড়ি খোঁজার সেই শুরু।

প্রথমে তিনি বই আর খবরের কাগজ পড়ে কলকাতা শহরেই কয়েকটা ভুতুড়ে বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর করলেন। দেখেশুনে মনে হল ওসব গুজব। অন্তত ওই সব বাড়িতে ভূতের দেখা পাওয়া যাবে কি না, কিংবা কখন গেলে দেখা পাওয়া যাবে, তার কোনও গ্যারাণ্টি নেই। নিজে আর কত ঘোরাঘুরি করবেন ? তাই তিনি দালাল মারফত এমনি কোনও বাড়ির সন্ধানে রইলেন। তবে আগে নিজে গিয়ে পরখ করে

আসতে হবে সত্যি ভূতের দেখা মিলবে কি না ? নয়তো মার্টিনকে নিয়ে হাজির হয়ে তারপর বিফল হয়ে ফেরা বড় লজ্জার হবে। টার্নবুলের কানেও ঠিক পৌঁছে যাবে খবরটা। অতএব স্বয়ং সরেজমিনে তদন্ত করে তবে মার্টিনকে নিয়ে যাব। মহেন্দ্রবাবুর মনে ভরসা, ভুতুড়ে বাড়ির কাহিনী তো অজস্র শোনা যায়, ছাপাও হয়। অমন বাড়ির খোঁজ পেতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

ভূত আছে কি নেই ? তা নিয়ে মহেন্দ্রবাবু আগে কখনও মাথা ঘামাননি। ভূত দেখার নামে তাঁর মনে কোনও ভয়-টয় হল না। বরং একটু কৌতূহলই জাগল।

তবে ব্যাপারটা যত সহজে এগোবে বলে ভাবা গিয়েছিল তা মোটেই হল না।

প্রথমে চার-পাঁচজন বাড়ির দালাল এসে দেখা করে অমন অদ্ভুত বাড়ির অর্ডার শুনেই হাওয়া হল। একজন আবার মহেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সোদপুরে এক পোড়ো বাড়িতে কাটিয়েছিল এক রাত। উঃ, সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা তিনি কদাপি ভুলবেন না। ভাঙাচোরা আগাছায় ভরা ছোট্ট এক বাড়ির উঠোনে ঠায় বসে। সারারাত মশার কামড় খেয়ে শরীর ঢোল। তার ওপর কেবলই ভয়, এই বুঝি সাপে ছোবলায় ? অথচ এত কষ্ট করেও কোনও ভূতের দর্শন মেলেনি।

ভোর হতে মহাখাপ্পা চৌধুরী প্রচণ্ড দাবড়ালেন দালালটিকে। সে বেচারি কাচুমাচু। মিনমিন করল, "কী করব বাবু ? লোকে যে বলল দেখা পাওয়া যাবে ঠিক।" নেহাত দয়ার বশেই দালালটির হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন মহেন্দ্রবাবু বাড়ি ফেরেন।

অনুসন্ধানের ব্যাপারটা গোড়ায় গোপনেই চলছিল। ক্রমে জানাজানি হয়ে যেতে হুলুস্থুল লেগে গেল। মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, ভাই,কাছেপিঠের আত্মীয়-বন্ধুরাএসে বোঝাল "এ কী কাণ্ড ! এ কী পাগলামো ! ভূত-প্রেত-দানো নিয়ে কি ছেলেখেলা ? বেঘোরে প্রাণটা যাবে যে ?"

মহেন্দ্রবাবু অনড় অটল। তাঁর মুখে এক রা—"বড়মুখ করে মার্টিনকে কথা দিয়েছি। প্রেস্টিজের ব্যাপার। আমার প্রেস্টিজ। ইণ্ডিয়ার প্রেস্টিজ। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট।"

তবে ডেন্‌জারাস টাইপের ভূত-প্রেত সম্বন্ধে তিনি সাবধান হবেন ঠিক করলেন। বেশি বাড়াবাড়ির দরকার কী ? তেমন পাল্লায় না পড়াই উচিত।

মায়ের আকুল চিঠি পেয়ে মেয়ে ছুটে এল কানপুর থেকে বাবাকে বোঝাতে। মহেন্দ্রবাবু টললেন না। মহেন্দ্রবাবুর আত্মীয়-বন্ধু সবাই মহা দুশ্চিন্তায় কাটাতে লাগল। এই সময় নটবর ও মহেন্দ্র চৌধুরীর সাক্ষাৎ।

মর্নিংওয়াক সেরে ফিরছিলেন মহেন্দ্রবাবু। রাস্তার মোড়ে একটি লোক তাঁকে নমস্কার করে বলল, "আপনি নাকি ভুতুড়ে বাড়ির খোঁজ করছেন শুনলাম ?"

"হুম্।"

"আমার সন্ধানে তেমন বাড়ি একখানা আছে স্যার।"

মহেন্দ্র চৌধুরী ভাল করে দেখলেন লোকটিকে। ছোটখাটো শুকনো চেহারা। চকচকে চোখ। পাট করে আঁচড়ানো চুল। পরনে আধময়লা ধুতি-শার্ট। পায়ে চপ্পল। বয়স চল্লিশের বেশি মনে হয় না।

"কোথায় ?" চৌধুরীর জলদগম্ভীর প্রশ্ন।

"তারকেশ্বর লাইনে এক গ্রামে।"

"তুমি মানে আপনি কে ?"

"আমি স্যার নটবর সিংগি, ব্রোকার। বাড়ির দালালি করি। আমায় তুমিই বলুন। আপনি স্যার অনেক সিনিয়র।"

"আমায় সেখানে ভূত দেখাতে পারবে ?"

"আজ্ঞে পারব।" নিচু গলায় দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল নটবর।

চৌধুরীমশায়ের মুখে সংশয়ের ছায়া দেখে নটবর আরও বিস্তারিত হয়—"ওটা মজুমদারদের বাড়ি। ওরা একসময় জমিদার ছিল ওখানে। এখন ও বাড়িতে কেউ থাকে না। বিক্রি করতে বা ভাড়া দিতে চায় বাড়িটা। কিন্তু বদনাম হয়ে গেছে তাই কিনছে না কেউ, ভাড়াও নিচ্ছে না। আপনাদের আশীর্বাদে আমার কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানা আছে। মজুমদার ফ্যামিলির একজন আমায় রিকোয়েস্ট করেছেন বাড়িটা দোষমুক্ত করে যাহোক একটা গতি করতে। এমনি খুঁতে বাড়ি নিয়েই আমার বেশি কারবার। কমিশনটা বেশি পাওয়া যায় যে।"

"অলরাইট। ভূত যদি দেখাতে পারো বাড়িটা আমি ভাড়া নেব কিছুদিনের জন্য, ঠিক ওই অবস্থায়।"

"তাই হবে স্যার। তারপর না হয় বাড়িটা শোধন করা যাবে।"

"দেখ,ফাইনালি রাত কাটাবার আগে বাড়িটা আমি একবার দেখে আসতে চাই। য়াতায়াতের খরচা আমার। প্লাস, তোমার একদিনের চার্জ।" সোদপুরের সেই হতচ্ছাড়া জঙ্গলে পোড়ো বাড়িতে রাত কাটানোর যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা স্মরণ করেই এই প্রস্তাবটি দিলেন চৌধুরী।

"কোনও অসুবিধে নেই," নটবর রাজি, "কবে যাবেন ?"

"কালই যেতে পারি," বললেন চৌধুরী।

তাহলে স্যার কাল হাওড়া স্টেশনে চলে যাবেন সকাল নটা নাগাদ। আমি অপেক্ষা করব পাঁচ নম্বর গেটের সামনে বাড়ি দেখে সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন।"

এরপরই নটবরকে নিয়ে মহেন্দ্র চৌধুরীর মজুমদার-বাড়ি দেখতে যাওয়া।

শনিবার। সন্ধ্যার ঠিক আগে নটবরের পিছু-পিছু মজুমদার বাড়িতে ঢুকলেন মহেন্দ্র চৌধুরী। তখনও দিনের আলো রয়েছে। তবু চৌধুরীমশাই অনুভব করলেন পরিবেশটা কেমন থমথমে। এখানকার বাসিন্দা পায়রাগুলিরও সাড়াশব্দ নেই। তিনি দেখলেন, জলসাঘরের জানলার কাছে বারান্দায় একটা ছোট তক্তপোশ। তাতে শতরঞ্চি পাতা এবং একটি গোবদা তাকিয়া রাখা।

নটবর বলল, "এই চৌকিটায় বসব স্যার। আমি হারুকে দিয়ে পাতিয়ে রেখেছি। এখান থেকে গোটা মহলটা ওয়াচ্ করা যাবে।" নটবর জলসাঘরের ভিতরের বারান্দার দিকের জানলা ও দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে বাইরের দিকেরও একটা জানলা হাট করে দিল। একটু রহস্যময় হেসে বলল, "এই ঘরটাই আসল। দেখা যাক !"

ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। নটবর একটা হ্যারিকেন জ্বেলে শিখাটা কমিয়ে রাখল চৌকির নীচে। আলোর ছোট একটু বৃত্ত ছড়িয়ে পড়ল বারান্দায়। নটবর বলল, "এইটুকু আলোই ভাল। সাপখোপের হাত থেকে নিশ্চিন্দি। অবশ্য এ বাড়িতে

ওসবের ভয় নেই শুনেছি। তাছাড়া টর্চ তো রয়েইচে। তবে নেহাত প্রয়োজন না হলে টর্চ মারবেন না। তেনাদের ডিসটার্ব হতে পারে। কী, আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

"না না ঠিক আছে।" চৌধুরী তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে এসেছেন। সঙ্গে আছে এক ফ্লাস্ক কফি। মশক-বিতাড়নী ওষুধ মেখে নিলেন গায়ের খোলা জায়গায়। পাশে বসা নটবরকে টিউবটা দিয়ে বললেন, "তুমিও মেখে নাও, যা মশা।" চারদিক নিঝুম। মুখে সাহস দেখালেও কী একটা অস্বস্তি যেন চেপে বসে বুকে।

ঢং-ঢং-ঢং···। দেয়াল-ঘড়ির সুগম্ভীর আওয়াজে সহসা চৌধুরীর ঝিমুনি কেটে গেল। তিনি ধড়ফড় করে খাড়া হয়ে বসলেন। আরও কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনি হল। শব্দটা এল জলসাঘরের ভিতর থেকে। কিন্তু ও ঘরের ঘড়ি যে বন্ধ। বসার আগেও লক্ষ করেছেন। নিজের রেডিয়াম লাগানো রিস্টওয়াচে সময় দেখলেন চৌধুরী—রাত ঠিক বারোটা। জানলা-পথে দেখতে পেলেন জলসাঘরের মধ্যে মৃদু আলো। তিনি উবু হয়ে বসে উঁকি দিলেন ঘরের ভিতরে। এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ঘরে জোড়া-তক্তাপোশে পাতা কার্পেটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে এক মধ্যবয়সী পুরুষ। পরনে তাঁর জরিপাড় ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি। হাতে তানপুরা। সেই যেটা রাখা ছিল ওখানে। কাছে শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর সুদৃশ্য বাতিদানে জ্বলছে একটি মোমবাতি। তারই নরম আলো ছড়িয়েছে বিশাল কক্ষে। ঝিকমিক করছে উপরে ঝাড়লণ্ঠনে স্ফটিকের মতন কাচের খণ্ডগুলি। লোকটির মুখ ভাল করে নজর করে চমকে উঠলেন চৌধুরী। দেয়ালের পোর্ট্রেটগুলির একজনের যেন জীবন্ত রূপ। অবিকল সেই মুখ, সেই চুল, সেই গোঁফ, সেই পোশাক! সেই ভঙ্গি!

পিড়িং পিড়িং—মিঠে আওয়াজ উঠল। কোলের তানপুরায় লোকটির আঙুল নড়ছে। তারপরই শুরু হল গান। সুমিষ্ট চাপা গলা। ওস্তাদি সঙ্গীত। এ ধরনের গান বোঝেন না চৌধুরীমশাই। তিনি ভীষণ অবাক হলেন। তার-ছেঁড়া ওই তানপুরাটা বাজছে কী ভাবে? মিনিট পনেরো চলল সেই গান। সম্মোহিত হয়ে শোনেন চৌধুরীমশাই ও নটবর।

হঠাৎ কারও গলা শোনা গেল, "আঃ, লাগছে না। সুর ঠিক লাগছে না রে।"

তক্ষুনি থেমে গেলেন গায়ক। দেয়ালে প্রতিকৃতিগুলির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে কাতর স্বরে বললেন, "কাকামণি, একবার দেখিয়ে দিন।"

অমনি শোনা গেল গান। সুর একই। অন্তত তফাত কিছু ধরতে পারলেন না চৌধুরী। কিন্তু ভিন্ন কণ্ঠে। একটু কর্কশ ও জোরালো। গান যেন ভেসে আসছে ছবিগুলির কাছ থেকে। মুগ্ধ ভাবে শুনছেন নীচে বসা গায়ক। মাথা নাড়ছেন তালে তালে।

মহেন্দ্র চৌধুরী নিজের চোখ ও কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না।

মিনিট-দুই বাদে অদৃশ্য গায়কের কণ্ঠ নীরব হল। ফের তানপুরা বাজিয়ে গান শুরু করলেন ঘরের পুরুষটি। আধ-ঘণ্টাটাক চলল সুরের খেলা। থামলেন গায়ক। তানপুরা শুইয়ে রাখলেন পাশে। তারপর কাউকে উদ্দেশ করে

বললেন, "ওরে একটু শরবত দে। গলাটা শুকিয়ে গেছে।"

ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্—নূপুর-পরা কোনও অদৃশ্য পদক্ষেপ এগিয়ে এসে থামল গায়ক-পুরুষের কাছে। গায়ক হাত বাড়ালেন। আর যেন মন্ত্রবলে তাঁর হাতে আবির্ভূত হল একটি কাচের গেলাস। তাতে সবুজ রঙের পানীয়।

গায়ক ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে শরবতটুকু শেষ করে খালি গেলাসটা বাড়িয়ে দিলেন শূন্যে। কী আশ্চর্য, গেলাসটি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল তাঁর মুঠো থেকে! আবার ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্—দূরে চলে গেল নূপুরের আওয়াজ।

গায়ক ফের তানপুরা তুলে নিয়েছেন, ঠিক তখুনি নিচু সুরে ডাক শোনা গেল—"হুজুর।"

ডাকটা যেন এল বারান্দার দিকে দরজার কাছ থেকে।

গায়ক খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী রে?"

"আজ্ঞে ছোট-মা বলছেন অনেক রাত হল।" দরজার কাছ থেকে উত্তর আসে।

অমনি জলসাঘরের স্তব্ধ ঘড়ি ঢং করে ঘোষণা করল—রাত একটা।

চৌধুরীদের চৌকির নীচে বাতির আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল জলসাঘরের দরজা অবধি। মহেন্দ্রবাবু প্রাণপণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করেও কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না দরজার কাছাকাছি। তাঁর সারা গায়ে কাঁটা দিল।

"তাই তো, অনেক রাত হয়েছে, এখনও জেগে! ছি ছি"—বলতে বলতে ব্যস্তভাবে তানপুরা নামিয়ে রেখে উঠে পড়লেন গায়ক। চৌধুরী দেখলেন গায়ক-পুরুষ দরজা দিয়ে বেরিয়ে চৌধুরীদের উলটো দিকে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চকিতে মিলিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জলসাঘরের বাতি গেল নিবে। ঘর ডুবে গেল ঘোর অন্ধকারে।

কঠিন ধাতের মহেন্দ্র চৌধুরীরও বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। নিঃশব্দে তিনি গরম কফি ঢেলে খেতে লাগলেন নার্ভ শক্ত করতে।

আবার ঘণ্টাখানেক চুপচাপ অপেক্ষা। মনে হল, বোধহয় আর কিছু ঘটবে না। সহসা খানিক দূরে বারান্দায় দেখা গেল একটা আলো। সামনে নুইয়ে-পড়া, গায়ে জোব্বা এক দীর্ঘ মূর্তি, হাতে ছোট একটি লণ্ঠন ঝুলিয়ে ধীরে-ধীরে চলেছে। বাতির আলোয় তাঁর ধবধবে সাদা দাড়ি জানিয়ে দিচ্ছে যে মানুষটি বৃদ্ধ।

"দাদুভাই।" কাঁপা স্বরে ডাকলেন বৃদ্ধ।

অমনি শিশুকণ্ঠের খিল্‌খিল হাসির আওয়াজ ভেসে এল অন্ধকার দোতলা থেকে।

"রেলিং-য়ে ঝুঁকো না দাদু।" বৃদ্ধের কণ্ঠে মিনতি।

ফের সেই শিশুকণ্ঠের হাসি।

এরপরেই যা ঘটল দেখে চৌধুরীমশাই কাঠ।

শিশুটির হাসির আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল দোতলার বারান্দা দিয়ে চলেছেন আলো হাতে সেই বৃদ্ধ। কাঁপা গলায় আবার ডাক শোনা গেল—"দাদুভাই।"

ফের সেই হাসি। এবার মনে হল ছাদ থেকে। পলকের মধ্যে লোকটি একতলা থেকে দোতলায় গেল কীভাবে? চৌধুরী রীতিমত ঘামতে থাকেন। দোতলার বারান্দায় চলতে চলতে হঠাৎ মিলিয়ে গেল আলো। অদৃশ্য হলেন সেই বৃদ্ধ। আর তাঁর দেখা পাওয়া গেল না।

বাকি রাতে মজুমদার-বাড়িতে আর কোনও অলৌকিক ঘটনা দেখতে পেলেন না মহেন্দ্রবাবু।

ভোরবেলা মজুমদার-বাড়ি থেকে বেরিয়েই মহেন্দ্রবাবু নটবরকে বললেন, "এই বাড়িটা আমি ছ'মাসের জন্য ভাড়া নেব। কত ভাড়া?"

"আজ্ঞে মাসে তিনশো টাকা। কথা বলে রেখেছি।"

"অলরাইট্। আর তোমার ফিজ?"

"সে যা হয় দেবেন।"

"আমার সাহেববন্ধু মার্টিন এলে তোমাকেই কিন্তু তাকে নিয়ে আসতে হবে এ-বাড়িতে ভূত দেখাতে।"

"ঠিক আছে স্যার।"

দুজনে কলকাতায় ফিরলেন।

পরদিন সকালে মহেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই পিনাকী চৌধুরী অ্যাডভোকেটের চেম্বারে উঁকি দিল নটবর।

পিনাকী চৌধুরী ডাকলেন, "আসুন আসুন। হুঁ সব শুনেছি। ওয়েল, অপারেশন গোস্ট সাক্‌সেসফুল। কনগ্র্যাচুলেশনস্।"

বিগলিত হেসে নটবর বলল, "আজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদে। নটবর সিংগি যখন দায়িত্ব নিয়েছে—"

"আপনার বিল? কত দিতে হবে?" চৌধুরীর গম্ভীর প্রশ্ন।

"আজ্ঞে এক হাজার।"

"সে কী!"

"আজ্ঞে বেশি চাইছি না," নটবর বিনীতভাবে বোঝায়, "ম্যাজিক পার্টিই তো নিল পাঁচশো। এছাড়া হারু, মাইক্রোফোন ফিটিং আরও কত টুকিটাকি খরচা। আমার ভাগে কী এমন রইল?"

"বাড়ি ভাড়া তো পুরোটাই নিজে মারবেন?"

"তাই কি হয় স্যার?" নটবর জিভ কাটে।

"হুম্।" ঝানু উকিল পিনাকী চৌধুরীকে ধাপ্পা দেওয়া অত সোজা নয়। যাহোক এ নিয়ে তিনি আর কথা বাড়ালেন না। একটা কৌতূহল মেটাতে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই নূপুরের আওয়াজ, অদৃশ্য মানুষের কথা গান কী করে করল আপনার ম্যাজিশিয়ান? ভেনট্রিলোকুইজম অর্থাৎ স্বরক্ষেপণ বুঝি?"

"হ্যাঁ স্যার, ঠিক ধরেছেন। আরও কিছু কৌশল ছিল।"

"সাহেব ভূত দেখে বিশ্বাস করবে তো?"

"আলবত করবে। গ্যারান্টি দিচ্ছি। তখন বরং আরও দু-চারটে আইটেম বাড়িয়ে দেব। ওই একই চার্জে হয়ে যাবে।"

টাকা নিয়ে নটবর বিদায় নিল।

পিনাকী চৌধুরী ভাবেন, মার্টিন আসবে কি না সন্দেহ? লিখেছে তো হাওয়াই দ্বীপে বেড়াতে যাচ্ছে। তবে দাদার চিঠি পেয়ে ভূত দেখার লোভে না মাইণ্ড চেঞ্জ করে।

তিনি চটপট হিসেব কষলেন—ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া আঠারোশো। নটবরের চার্জ হাজার। মার্টিন এলে আরও হাজার। মোট, তিন হাজার আটশো।

যাকগে, চৌধুরী ব্রাদার্সের পকেট থেকে হাজার-চারেক টাকা খসলে খুব কিছু গায়ে লাগবে না। কিন্তু এবার নিশ্চিন্ত। ভূতের খপ্পরে পড়ে দাদার আর অ্যাকসিডেন্টের ভয় রইল না।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

Amela—6 (2.10.85)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

টারজান, আমাকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে চলো ! এখানে থাকলে আমি বাঁচব না !

পুরনো বন্ধু আকুতকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিতে চান টারজান ! কিন্তু রয়্যাল জুলজিক্যাল সোসাইটির কর্তা সার্ জেমস্ কাট্ওয়েল তাকে ছাড়তে রাজি নন ।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ল্যাকমে কসমেটিক সাবান
বিশেষ ত্বক মোলায়েমের অয়েলে সমৃদ্ধ

ত্বকের স্বপ্নময় লাবণ্যের জন্যে.

অনুভব করুন অঙ্গ ঘিরে ল্যাকমে কসমেটিকের ক্রীমেভরা ফেনা, নিজেই বুঝবেন সুরভিত এই ফেনার জাতই আলাদা।

এইতো ত্বককে মোলায়েম করা বিশেষ তেলের আদরভরা পরশ, যা আপনার ত্বককে করে তোলে পেলব কোমল, লাবণ্যে ঢলঢল।

ল্যাকমে কসমেটিক সাবান।

প্রতি রমণীর কমনীয় ত্বকের স্বপ্ন আজ সার্থক।

Lakmé

হারানো-প্রাপ্তি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিকেরা কীভাবে কাজ করেন ? প্রথমে একটা জিনিস আন্দাজ করে নেন। সেই ধারণাটা যখন ঠিক বলে মনে হয়, তখন তা সরজমিন প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগেন। যেসব জীববিজ্ঞানী বিশেষভাবে ফসিল নিয়ে কাজ করেন, একেকটা ফসিলের খোঁজে একেক দেশে তাঁদের পাড়ি দিতে হয়েছে। আগে থেকে তাঁদের আঁচ করে নিতে হয়েছে কোথায় গেলে কোন্ ফসিলটা তাঁরা পাবেন। তারপর শুরু হয় সেইখানে তন্ন-তন্ন করে খোঁজা। অনেকটা বেনাবনে মুক্তো খোঁজার মতোই রীতিমত দুঃসাধ্য কাজ।

একজন ছিলেন ইউজিন দুবোয়া। নিজের মত প্রাণপণে আঁক্‌ড়ে থাকা আর শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে তা প্রমাণ করে ছাড়া—এ-কাজে তাঁর জুড়ি ছিল না।

১৮৭৭ সালে হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যা আর বিজ্ঞান পড়বার সময় গবেষণার দিকে তাঁর মন গেল। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে অধ্যাপক হলেন। কাজটা ভাল। উন্নতিরও যথেষ্ট আশা ছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই দুম করে তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দিলেন। কেন ?

এবার সেই কথায় আসছি।

জীববিজ্ঞানে 'হারানো-সূত্র' বলে একটা কথার চলন আছে। চলতি কথায় যাকে আমরা খেই হারানো বলি। আমরা বানর জানি, মানুষও জানি। কিন্তু এ দুয়ের মাঝখানে ছিল আরেকটা ধাপ। ইংরিজিতে বলে 'এপ্-ম্যান'। বাংলায় একটু ঘুরিয়ে বলা যায় 'নরবানর'। বা 'মর্কটমানব'। বানর আর মানুষের মাঝখানের যোগসূত্র। মর্কট বা বানর বলতে—যাদের ল্যাজ নেই, দু'পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেই বানর বা মর্কট।

এই হারানো-সূত্রের ফসিল খুঁজে বার করার জন্যে দুবোয়া মরিয়া হয়ে উঠলেন। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তখন ওলন্দাজদের অধীনে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, সেখানে গেলে এই হারানো-সূত্রের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওলন্দাজ সরকারকে তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন যাতে সরকারিভাবে তাঁকে এই তত্ত্বতল্লাশের কাজে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁর কথায় তারা কান দিল না।

তখন তিনি পল্টনে ডাক্তারের চাকরি নিয়ে সেই সুবাদে চলে গেলেন পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার কাজে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন।

দুবোয়া ধরে নিয়েছিলেন, মানুষের যে হারানো পূর্বপুরুষের ফসিলের তিনি খোঁজ করছেন, সেই ফসিলের বয়স লাখ-দশেক বছর হবে। ইন্দো যবদ্বীপে পৌঁছে সেই বয়সের ফসিলের স্তর তিনি পেয়ে গেলেন। খড়ের গাদা তো পাওয়া গেল, এবার শুরু হল তার ভেতর থেকে ছুঁচ খোঁজার পালা।

সে কি সোজা কাজ ? মাথার চুলে উকুন খোঁজার মতো করে সরু চিরুনি দিয়ে একটার পর একটা জায়গা তিনি আঁচড়ান। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। আর-কেউ হলে হাল ছেড়ে দিত। কিন্তু দুবোয়ার অসীম ধৈর্য। অটল সংকল্প। শেষকালে খুঁজতে-খুঁজতে ১৮৯১ সালে এমন একটা মাথার খুলি (চোখ আর কানের ওপরের অংশের মাথার হাড়) আর এমন কয়েকটা দাঁত পাওয়া গেল, যা এর আগে কেউ কখনও দেখেনি। দেখতে স্পষ্টই মানুষের মতো, আবার কতকটা মর্কটের মতনও বটে। তার বছরখানেক পরে ওই একই জাতের মানুষের একটা পায়ের হাড়ও তিনি খুঁজে পেলেন।

খুঁজে পাওয়ার আগেই হারানো-সূত্রটির একটা নাম দেওয়া হয়েছিল। দুবোয়া যবদ্বীপী মানুষটির সেই নামই রাখলেন। নাম হল : 'হোমো ইরেক্টাস'। অর্থাৎ, খাড়া-মানব। ফসিলটি মানুষেরই বটে, তবে বানরের সঙ্গেও তার চেহারায় তখনও মিল ছিল।

তারপর এই একশো বছরে দেশে-দেশে মানুষের পূর্বপুরুষের আরও কিছু-কিছু ফসিলের সন্ধান মিলেছে।

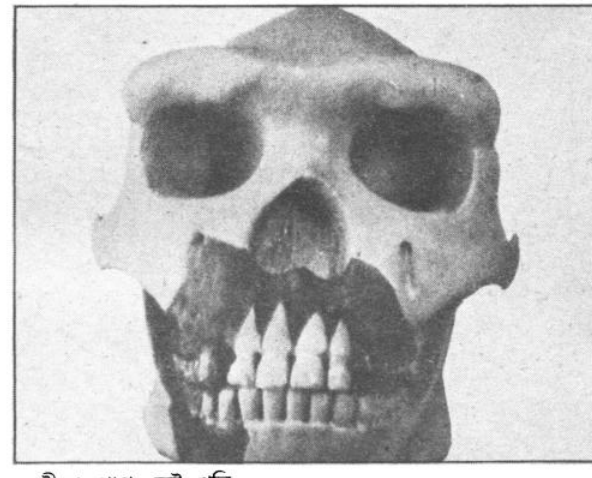

যবদ্বীপে প্রাপ্ত সেই খুলি

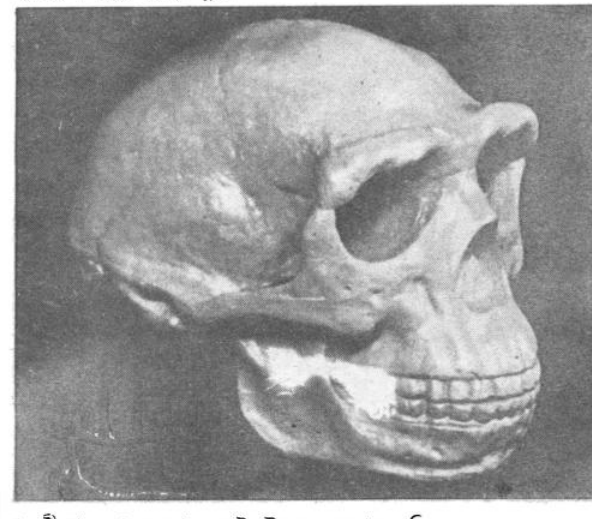

যবদ্বীপের চেয়ে আর-একটু উন্নত [illegible]স্থার খুলি

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিনথ – যা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2418 BG

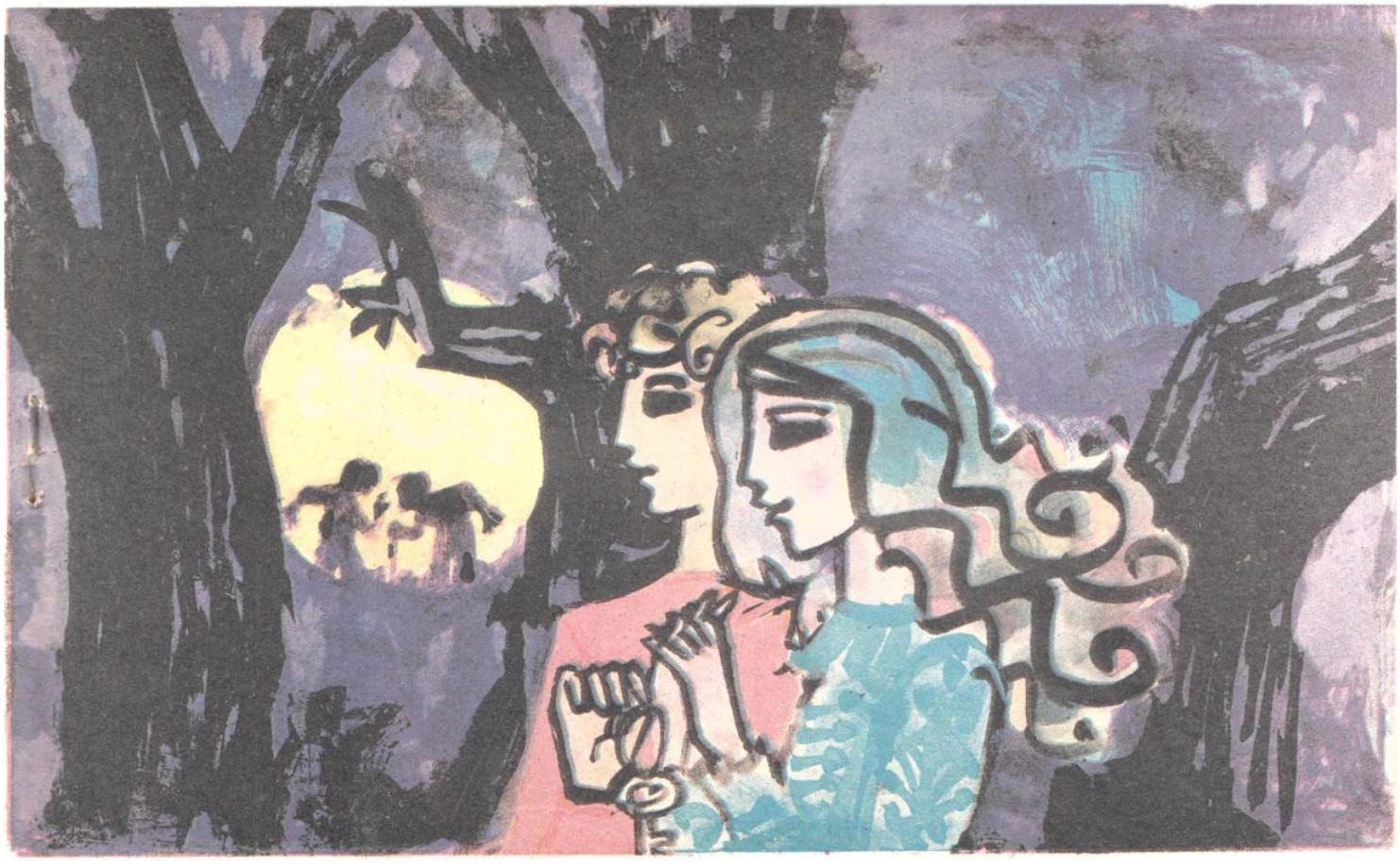

পূজার নাটক

চাবি

শৈলেন ঘোষ

প্রথম দৃশ্য

রাজার শোবার ঘর। পিছনে দুদিক থেকে দুটি ঝালর দেওয়া পর্দা কোনাচে করে ঝোলানো। মঞ্চের বাঁ দিকে চৌকির ওপর বিছানা পাতা। ডান দিকে একটি আরাম-কেদারা। ঠিক তার পাশে নকশার কাজ-করা সুন্দর একটি সাইড-টেবিল। টেবিলের ওপর সোনার দোয়াতে কালি। পালকের কলম। দু'দিকে দু'টি ফুলদানি। তাতে ফুলের গুচ্ছ। সকাল। পাখির কলতান। দুই পর্দার ফাঁক দিয়ে আকাশের নরম আলো ঘরে তেরছা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজা আরাম-কেদারায় বসে, সাইড-টেবিলে হাত রেখে কিছু লিখছেন। তাঁর মুখে খুশির ছোঁয়া। রাজা পরে আছেন পাঞ্জাবি, পাজামা, তার ওপর আঙরাখা। আঙরাখার কোমরে সরু রেশমি-দড়ির ঝলমলে বাঁধন। গলায় মণিমুক্তার মালা। পায়ে জরির কাজের চপ্পল। যৌবন পেরিয়েছেন সবে। গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার। রাজা লিখতে-লিখতে কখনও উঠছেন। কখনও হাঁটছেন। কখনও ঠোঁটে কলম ঠেকিয়ে ভাবছেন। আবার বসছেন। পালকের কলম কালিতে ডুবিয়ে লিখছেন। যেটি লিখছেন, সেটি বিড়বিড় করছেন। বোঝা গেল রাজা কবিতা লিখছেন।

রাজা ॥ [লিখতে-লিখতে কলম থামিয়ে] চমৎকার ! চমৎকার ! [উঠে দাঁড়িয়ে, আবৃত্তি করে]

গোবরগণেশ টোপর মাথায় পালকিতে যেই চড়ল,
পটাশ করে পালকি ভেঙে ধপাস করে পড়ল।

[খুশিতে উছলে] চমৎকার ! [আবার ভাবতে-ভাবতে, পায়চারি করতে-করতে ফুলদানি থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে সেটি নাকে ধরে] হ্যাঁ, হয়েছে। [কেদারায় বসে পড়ে, লিখতে-লিখতে]

তাই দেখে যেই বিয়ের কনে হাসল লাজে মুচকি,
গোবরগণেশ দে টেনে ছুট ফেলেই বোঁচকা-বুঁচকি।

[খুশিতে হেসে উঠে] হা-হা-হা ! চমৎকার !

হাসির মধ্যেই মন্ত্রী ঢুকলেন। দূর থেকে অভিবাদন করলেন। কাছে আসতে ইতস্তত করতে লাগলেন। মন্ত্রীর পরনে কুর্তা, চুড়িদার পাজামা, জ্যাকেট, পাগড়ি, মালা, জরিদার জুতো এবং কোমরে, বাঁ দিকে তলোয়ার। বয়স পঞ্চাশ। দাড়ি এবং গোঁফে কিছু-কিছু পাক।

রাজা ॥ [খুশিতে ডগমগ হয়ে] আরে আসুন, আসুন মন্ত্রীমশাই। আমার মাথার ভেতর এতক্ষণ তো আপনিই ছটফট করছিলেন। [চৌকির দিকে আঙুলের ইঙ্গিত করে] বসুন, বসুন। [মন্ত্রী বসলেন। অবাক হয়ে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন] আপনার নামে একটা দারুণ কবিতা লিখে ফেলেছি। শুনুন :

গোবরগণেশ টোপর মাথায় পালকিতে যেই চড়ল,
পটাশ করে পালকি ভেঙে ধপাস করে পড়ল !
তাই দেখে যেই বিয়ের কনে হাসল লাজে মুচকি,
গোবরগণেশ দে টেনে ছুট ফেলেই বোঁচকা-বুঁচকি !

মন্ত্রী ॥ [আমতা-আমতা করে] আজ্ঞে হুজুর !

রাজা ॥ [হাসতে-হাসতে] বলুন, কেমন লিখেছি !

মন্ত্রী ॥ লিখেছেন তো ভালই, কিন্তু হুজুর আমার নাম তো গোবরগণেশ নয় !

রাজা ॥ আরে বাবা গোবরগণেশ হয়ে যেতে দোষ কী ?

মন্ত্রী ॥ [বিনয়ের সঙ্গে] হব কী করে ? আজ্ঞে আমি তো সত্যসাধন ।

রাজা ॥ [আকাশ থেকে যেন পড়লেন] সে কী মশাই ! সত্যসাধন ? কবে থেকে ?

মন্ত্রী ॥ [মাথা চুলকিয়ে] মানে, হুজুর, জন্ম থেকেই তো—

রাজা ॥ কী আশ্চর্য ! জন্ম থেকে ! অথচ—[একটু চিন্তা করে] ঠিক আছে, ঠিক আছে । একটা সত্যসাধন নামেই ভেবে ফেলা যাক— [এবার কালি-কলমে না লিখে মনে-মনে ভাবতে-ভাবতে আওড়াতে লাগলেন]

সত্যসাধন, সত্যসাধন, কানদুটি বেশ লম্বা,
ল্যাজ নাই থাক, গোঁফদুটি কি ল্যাজের চেয়ে কম বা ?

রাজা এবং মন্ত্রী দুজনেই প্রাণখুলে হেসে উঠলেন ।

মন্ত্রী ॥ কেয়াবাত ! কেয়াবাত !

রাজা ॥ [হাসতে-হাসতে] আপনার আসে ?

মন্ত্রী ॥ [হাসির রেশ কমিয়ে] আজ্ঞে আমার ? না, না । আমার এক মেসোর আসত ।

রাজা ॥ আপনার মেসো ? মানে, কবি ?

মন্ত্রী ॥ ঠিক কবি বলা না-গেলেও, কবির মতন, বলা যেতে পারে ।

রাজা ॥ [হো-হো করে হেসে] কবির মতন ! একটা কবিতা শুনি !

মন্ত্রী ॥ [অপ্রস্তুত হয়ে] সে কবেকার কথা !

রাজা ॥ চেষ্টা করুন না, ঠিক মনে পড়ে যাবে ।

মন্ত্রী ॥ [একটু আকাশের দিকে চোখ তুলে, ভেবে] মনে পড়েছে—

বে-বাড়িতে যেই বাজল সানাই,
মা জিগাসে কোথায় গেলি কানাই ?

রাজা ॥ [অবাক-স্বরে] থামুন, থামুন ! জিগাসে ? সে জিনিসটা কী ?

মন্ত্রী ॥ [থতমত খেয়ে] জিগাসে মানে, ওই জিজ্ঞেস করল আর কি !

রাজা ॥ [হেসে] ও বুঝতে পেরেছি । তারপর ?

মন্ত্রী ॥ [আবার শুরু থেকে]

বে-বাড়িতে যেই বাজল সানাই,
মা জিগাসে কোথায় গেলি কানাই ?

[থমকে থেমে, আর কিছু মনে না-আসায় সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করে আপনমনে বলে-ফেলার ভঙ্গিতে]

এরপরেতে কেমন করে বানাই !

রাজা ॥ [মন্ত্রীর কথা শুনতে পেয়েছেন । হেসে উঠেছেন] কেন ? খুব তো সহজ— [ছন্দ মিলিয়ে]

গিলছ বসে, কাজের বেলা গা নাই !

রাজা ও মন্ত্রী আবার দুজনেই প্রাণখুলে হেসে উঠলেন । হাসির শব্দের ওপর হঠাৎ শোনা গেল রাজবাড়ির বিপদ-ঘণ্টা বেজে উঠেছে । শোনা গেল ব্যস্তপায়ের ছোটাছুটির শব্দ । মন্ত্রী ও রাজা সচকিত হয়ে উঠলেন ।

রাজা ॥ [বাইরের দিকে তাকিয়ে] ওহে প্রহরী, তোমরা এমন ব্যস্ত হয়ে ছুটছ কেন ?

প্রহরী ॥ [ছুটতে-ছুটতে ঢুকল । হাঁপাচ্ছে । মুখে-চোখে ভয়] আপনার কাছেই আসছি হুজুর !

রাজা ॥ কেন ? কী ব্যাপার ?

প্রহরী ॥ [কাঁপা স্বরে] রত্ন-ভাণ্ডারের চাবি খোয়া গেছে !

রাজা ॥ [চমকে] এঃ ! কী সর্বনাশ ! কেমন করে খোয়া গেল ?

প্রহরী ॥ জানা যাচ্ছে না হুজুর !

রাজা ॥ [অস্থির হয়ে] আমি তো কাল নিজে রত্ন-ভাণ্ডারে গিয়েছিলুম । আমার সামনেই তো রত্ন-ভাণ্ডারের ফটকে চাবি দেওয়া হল ।

প্রহরী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ । তারপরেই ভাণ্ডার-রক্ষী চাবিটি আর খুঁজে পেলেন না ।

রাজা ॥ [হতবাক হয়ে] এ তো আচ্ছা রহস্যময় কাণ্ড ! মন্ত্রীমশাই, রত্ন-ভাণ্ডারের দ্বিতীয় চাবিটি কোথায় আছে ?

মন্ত্রী ॥ দ্বিতীয় চাবিটি আপনার বাবা নিজে রাখতেন । তাঁর মৃত্যুর পর সেটিও পাওয়া যায়নি ।

রাজা ॥ [অবাক হয়ে] সে কী ! এতদিন ধরে এই ভয়ংকর ব্যবস্থায় কাজ হয়ে আসছে ! কই, আমায় কিছু জানাননি তো ?

মন্ত্রী ॥ ভয়ের কোনও কারণ নেই বলেই আপনাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করিনি ।

রাজা ॥ [তীক্ষ্ণ স্বরে] এ-রাজ্য কার ?

মন্ত্রী ॥ [শান্তস্বরে] মহামান্য আপনার ।

রাজা ॥ তবে জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি কেন ?

মন্ত্রী ॥ কারণ, আমাদের রাজাধিরাজের রাজ্যে কোন অসৎ মানুষের বাস নেই । এখানে যদি কোনও অসৎ মানুষ থাকত, তবে, রত্ন-ভাণ্ডারের দ্বিতীয় চাবিটি খোয়া যাবার পর, নিশ্চয়ই ভাণ্ডারের ধন-রত্ন চুরি হয়ে যেত ।

রাজা ॥ [ক্ষুব্ধ হয়ে] অসৎ মানুষ নেই, এই আপনাদের এক কথা । তাই বলে সাবধান হবেন না ? বিপদ ঘটলে তখন কে রক্ষা করবে ? যান, তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি চালান । ঢোল-শহরত করে ঘোষণা করে দিন, চাবিটি যে ফেরত দেবে, তাকে আমি নিজে একটি রত্ন-হার পুরস্কার দেব ।

মন্ত্রী ॥ যথা আজ্ঞা । [প্রহরীকে] এসো আমার সঙ্গে ।

মন্ত্রী ও প্রহরী দ্রুত বেরিয়ে গেল । নিমেষে রাজার সেই চিন্তাগ্রস্ত মুখের ওপর হাসির রেখা দেখা দিল । রহস্য-ভরা সেই হাসি । আঙরাখার নীচে পরা পাঞ্জাবির পকেট থেকে তিনি একটি সোনার চাবি বার করে, দর্শকদের দেখালেন ।

রাজা ॥ [অত্যন্ত সতর্ক ও রহস্য-ভরা কণ্ঠে] এই সেই চাবি ! সবাই বলে আমার রাজ্যে নাকি সব মানুষই সৎ । সেটি পরখ করে দেখার জন্যেই আমি রক্ষীর চোখে ধুলো দিয়ে এই চাবিটি নিয়ে এসেছি । এবার চাবিটি আমি রাস্তায় ফেলে দেব । নিজে ছদ্মবেশে লুকিয়ে এটির ওপর নজর রাখব । দেখব, কোন সৎ মানুষ এটি ফেরত দেবার জন্য রাজবাড়িতে ছুটে আসে । সুতরাং প্রচার হয়ে যাক রত্ন-ভাণ্ডারের চাবি হারিয়েছে ! চাবি, এই সেই চাবি ! হা-হা-হা ।

রাজার হাসির ওপরই কাড়া-নাকাড়ার শব্দ বেজে উঠবে । সঙ্গে-সঙ্গে যাবে আলো নিবে, পরের দৃশ্যে ওই কাড়া-নাকাড়ার শব্দের সঙ্গে আলো জ্বলে উঠবে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ওইদিন । সকালবেলা । মেঘাচ্ছন্ন দিন ।

হাট-বাজারের কেন্দ্র । বেচা-কেনা । মানুষের জটলা । আগের দৃশ্যের শেষে কাড়া-নাকাড়ার শব্দের সঙ্গে এই দৃশ্যের শুরু । কাড়া-নাকাড়ার শব্দ শুনে সকলেই সচকিত । দু'জন বাজনদার সমেত একজন রাজবাড়ির ঘোষক সেখানে উপস্থিত হল । সঙ্গে কয়েকজন সেনা । একটি উঁচু

জায়গায় ঘোষক দাঁড়াল। সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ল সেনারা। সঙ্গে-সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে ছুটে এল মানুষের দল। ঘোষক উঁচু গলায় ঘোষণা করল :

ঘোষক ॥ প্রিয় প্রজাগণ, আমাদের মহামান্য রাজাধিরাজ আপনাদের একটি ভয়ংকর দুঃসংবাদ শোনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। গতকাল আমাদের রত্ন-ভাণ্ডারের মহামূল্যবান চাবিটি রহস্যজনকভাবে খোয়া গেছে।

সমবেত শ্রোতারা উৎকণ্ঠায় গুঞ্জন করে উঠল

ঘোষক ॥ তাই রাজাধিরাজের ঘোষণা, চাবিটি যিনি পাবেন, দেরি না-করে সেটি রাজপ্রাসাদে ফেরত পাঠালে, তাঁকে মহারাজ স্বয়ং নিজের হাতে একটি রত্ন-হার পুরস্কার দেবেন।

আবার কাড়া-নাকাড়ার শব্দ। ঘোষকসহ সেনারা বেরিয়ে গেল। সকলেই সেই ঘোষণা শুনে অবাক। নিজেদের মধ্যে আলোচনা। হঠাৎ মেঘের গর্জন।

প্রথম পথিক ॥ [আকাশের দিকে তাকিয়ে]আকাশে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পথিক ॥ [আকাশের দিকে তাকিয়ে] ঝড় উঠবে মনে হয়।

প্রথম পথিক ॥ আশ্চর্য! এত সিপাই-সামন্ত, এমন কড়া ব্যবস্থা। কেমন করে রত্ন-ভাণ্ডারের চাবি হারায়, ভেবে পাই না।

দ্বিতীয় পথিক ॥ শুনেছি, ওই চাবিটি ছাড়া রত্ন-ভাণ্ডারের আর দ্বিতীয় চাবি নেই।

প্রথম পথিক ॥ তা হলে আরও বিপদ। রত্ন-ভাণ্ডারের ফটক এমন ধাতুতে তৈরি, ভাঙাও যাবে না।

আবার মেঘের গর্জন। এই ফাঁকে একে-একে অনেকেই আকাশের অবস্থা দেখে সেখান থেকে চলে গেছে।

দ্বিতীয় পথিক ॥ [মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক দেখে] বিপদ মাথায় নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না।

প্রথম পথিক ॥ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। চলো, পালাই।

দুজনেই বেরিয়ে গেল। এখন দেখা গেল, সেখানে একটি মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। সে অত্যন্ত সতর্কপায়ে, এদিক-ওদিক লক্ষ রেখে সন্দেহজনক ভঙ্গিতে সামনের দিকে এগিয়ে এল। তার গায়ে সবুজ-সাদা ডোরাকাটা কামিজ। পাজামা। কোমরে কাপড় জড়ানো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গোঁফ। চোখের চাউনিতে লোভ। পায়ে সাধারণ চপ্পল। সে দাঁড়াল। হঠাৎ হেসে উঠল। লোকটার নাম পাণ্ডা। মধ্যবয়সী।

পাণ্ডা ॥ [কোমরে জড়ানো কাপড়ের ভেতর থেকে চাবি বার করতে-করতে] হ্যাঁ, আমি একটা চাবি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। [চাবিটা বার করে] সোনার। তবে কি এই চাবিটাই রত্ন-ভাণ্ডারের ফটকের চাবি! [ভয় ও আনন্দ একসঙ্গে মুখের ওপর ভেসে উঠল] তা হলে তো রত্ন-ভাণ্ডারের সব ধন-রত্ন এখন আমার। উঃ! না-জানি সে কত! আমি এখন কী করি! আমার বুকের ভেতরটা এত ধড়ফড় করে উঠেছে কেন! না, না, এ-চাবি আমি ফেরত দেব না। কিছুতেই না। চাবি খুলে রত্ন-ভাণ্ডারের সব রত্ন আমি লুঠ করে আনব। আমি নিজেই রাজা হব। হা-হা-হা! আর দাঁড়াব না। কেউ টের পেয়ে যাবে। আমি পালাই।

জনসন্স বেবী লোশন
কেননা নরম ত্বক
আপনার বয়সকে গোপন করে রাখে

জনসন্স বেবী লোশন

একটি কোমল, গোলাপী লোশন...
ত্বককে কোমল রাখার ইমোলিয়েন্ট-এর
মিশ্রণ যা আপনার ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা
বজায় রাখার তরল পদার্থের মতই
কাজ করে।

তরুণ ত্বকে এই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি আপনার স্বাভাবিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে কোমল রাখার প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

আপনার ত্বক তেলতেলে হলেও এমনটি হতে পারে। কেননা আপনার ত্বকের কোমলতা নির্ভর করে শুধুই তার আর্দ্রতার ওপর। তেলতেলে শুকনো হওয়ার উপর নয়।

আপনার ত্বক যে রকমই হোক না কেন, জনসন্স বেবী লোশন আপনার ত্বকের নিজস্ব স্বাভাবিক তরল পদার্থের সাথে একযোগে কাজ করে। তাতে আনে প্রাণের জোয়ার ও আপনার রঙরূপে পুষ্টি যোগায়।

একটুখানি জনসন্স বেবী লোশনে কাজ পাওয়া যায় অনেক। এটি তেলতেলে নয় এবং এটি আপনার ত্বকে এত দ্রুত শুষে যায় যে এর কাজ শুরু হওয়া আপনি অনুভব করবেন। এটি আপনার ত্বককে কোমল রাখবে।

বয়সের চেয়ে আপনাকে ছোট দেখাবে।

জনসন্স বেবী লোশন। আপনার ত্বক কিছুতেই আপনার বয়স প্রকাশ করতে পারবে না।

পাণ্ডা ছুটে পালাল। কিন্তু সে দেখেনি, এতক্ষণ তার পিছনে একটু দূরে সেই উঁচু জায়গাটার আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে কেউ তাকে লক্ষ রাখছিল। তার গায়ে লম্বা কালো আলখাল্লা। কালো কাপড়ের আড়ালে মুখের আধখানা লুকনো। পায়ে চপ্পল। পাণ্ডা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে সে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে সে মুখের কালো কাপড়টা সরিয়ে নিল। দেখা গেল রাজা স্বয়ং। এ তাঁর ছদ্মবেশ। তিনি পাণ্ডা যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আবার বিদ্যুতের ঝলকানি। গর্জন। সেইসঙ্গে মঞ্চও অন্ধকার হয়ে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামের শেষপ্রান্তে বনের কিনারায় একটি ছোট্ট বাড়ি। সেই বাড়ির একটি ঘর। ঘরের ডান দিকে কোনাকুনি রাখা একটা শোবার চৌকি। বিছানা পাতা। একটা টুল, তারই পাশে। এককোণে একটি জলের কলসি। গেলাস। চৌকির নীচে থালা-বাসন। একটি লণ্ঠন। টিমটিম করে জ্বলছে। বাঁ দিকে ঘরে ঢোকার দরজা। বন্ধ। ডান দিকে ভিতরে বা অন্য ঘরে যাবার পথ। পিছনে, মাঝামাঝি একটা জানলা। খোলা।

এখন রাত। অবিশ্যি গভীর নয়। আগের দৃশ্যের জের টেনে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে। ঝড় বইছে।

লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় দেখা যাচ্ছে, দুটি ভাই-বোন ঘরের মেঝেয় পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। ভাইয়ের নাম, তাকা, বয়স দশ। পরনে কাপড়। এমনভাবে মালকোঁচা মারা আছে, দেখলেই মনে হয়, ফোলা সালোয়ার। পায়ের দিকে একটু খাটো। গায়ে একটা খাটো সাদা পাঞ্জাবি। তিকি তার বোন, বয়স সাত। গায়ে একটা লম্বা সাধাসিধে ফ্রক। দুজনেরই পোশাকে কোনও জৌলুস নেই। তারা দুজনেই এমনভাবে পড়ে আছে দেখলেই মনে হয়, ঢুলতে-ঢুলতে আর সামলাতে না-পেরে মাটিতে ঢলে পড়েছে। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে একটা বাজ পড়ল। বোন তিকির আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে পড়ল। ভয় পেয়েছে। জানলার দিকে তাকাল। দাদাকে দেখল। দাদার ঘুম ভাঙেনি। পিছু ফিরে শূন্য চৌকিটার দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেল। তারপর দাদার গায়ে অস্থির হাতে ঠেলা দিল :

তিকি ॥ [অস্থির হয়ে] দাদা, এই দাদা !

তাকা ॥ [ঘুম ভাঙল। চমকে উঠল] এঃ ! [ধড়ফড় করে উঠে বসল। জানলার দিকে তাকাল] ঝড় উঠেছে !

তিকি ॥ [ভয়ে] কী জোর একটা বাজ পড়ল !

তাকা ॥ [হঠাৎ চৌকিটার দিকে চোখ ফেরাল] পাণ্ডাকাকা আসেনি ?

তিকি ॥ [ভয়ে, ঢোঁক গিলে] কী জানি। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

তাকা ॥ [আঁতকে] এই রে ! সাড়া না-পেয়ে যদি ফিরে গিয়ে থাকে ! [একটু থেমে, চোখ বিস্ফারিত করে, দরজার দিকে চেয়ে] আজ বরাতে আবার পিটুনি আছে।

আবার মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের ঝলকানি।

তিকি ॥ [ব্যস্ত হয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে] জানলাটা বন্ধ করে দে, বন্ধ করে দে ! [সঙ্গে-সঙ্গে লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিল]

তাকা ॥ [উঠে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি টুলটা নিয়ে, জানলার কাছে ছুটে গেল। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে, জানলা বন্ধ করে] মনে হচ্ছে এ ঝড় আর থামবে না।

তিকি ॥ [দুশ্চিন্তা] তা হলে কী হবে ?

তাকা ॥ তা হলে পাণ্ডাকাকা আসবে না, আমাদেরও না-খেয়ে পড়ে থাকতে হবে !

তিকি ॥ [একটু চিন্তা করে] এই দাদা !

তাকা ॥ অ্যাঁ ?

তিকি ॥ [চাপাস্বরে] খাবি ?

তাকা ॥ [অবাক হয়ে] কী ?

তিকি ॥ [চুপিচুপি] খাবার আছে।

তাকা ॥ [আগ্রহে] কই ?

তিকি ॥ [চৌকির নীচে মাথা গলিয়ে দুটো নাড়ু বার করে আনল] এই যে, দ্যাখ। নাড়ু।

তাকা ॥ [ভয়ে ছটফট করে] রেখে দে, রেখে দে ! পাণ্ডাকাকার।

তিকি ॥ [তাকার মুখের কাছে হাত তুলে] তুই খেয়ে নে তো ! জিজ্ঞেস করলে বলব, ইঁদুরে খেয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কেউ ধাক্কা দিল। ধাক্কার শব্দ। তাকা ও তিকি দুজনেই হকচকিয়ে গেছে। দুজনেই চোখ-চাওয়াচাওয়ি করল। তিকি তাড়াতাড়ি নাড়ু দুটো আবার চৌকির নীচে রেখে দিল। আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল।

তাকা ॥ [তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোতে-এগোতে] যাই !

তাকা দরজা খুলে দিল। হুড়মুড় করে একজন অপরিচিত লোক ঢুকে পড়ল। গায়ে তার কালো আলখাল্লা। মাথায় কালো টুপি। পায়ে চপ্পল। নকল গোঁফ। পিঠে একটা পুঁটলি। তাকা ও তিকি জানতেও পারল না, ইনি রাজা, ছদ্মবেশে তাদের বাড়িতে এসেছেন। বৃষ্টির জলে ভিজে গেছেন।

তাকা ॥ [থতমত খেয়ে] কে !

তিকি ভয়ে দৌড়ে দাদার কাছে এল। দুজনেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা ॥ [ওদের মন থেকে ভয়টা সরিয়ে ফেলার জন্যেই হাসির রেশ মুখে ছড়িয়ে] ভয় পেও না। আমি একজন মুসাফির। দুর্যোগে বড় বিপদে পড়ে গেছি। আমায় যদি একটু আশ্রয় দাও !

তাকা ॥ [আচমকা সেই ভয়টা সামলে, একটু ব্যস্ত হয়ে] ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন !

রাজা ॥ বলো, কী অবস্থা ! সারাদিন ধরে আকাশে কী কাণ্ডটাই না চলছে।

তিকি ॥ [এই ফাঁকে টুলটা নিয়ে এসে] বসুন !

রাজা ॥ [বসতে-বসতে তিকির মুখের দিকে তাকালেন। মুখে তার বিস্ময়। আপনমনেই বলে উঠলেন] বাঃ ! [সঙ্গে-সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে নিলেন] তোমাদের কষ্ট দিলুম। [তিকি আবার দাদার পাশে গিয়ে দাঁড়াল]

তাকা ॥ [নরম গলায়] আপনি ভিজে গেছেন। [বলতে-বলতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল]

রাজা ॥ [মাথার টুপিটা খুলে, জল ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গি করে, আবার মাথায় পরতে-পরতে] মাথাটা বেঁচে গেছে। [পিঠের পুঁটলিটা নামাতে-নামাতে] হঠাৎ-হঠাৎ এমন সব বিপদ এসে হাজির হয় ! এই দ্যাখো না, কোথাও কিছু নেই, রাজার রত্ন-ভাণ্ডারের চাবিটি যে কোথায় গেল আর পাওয়া যাচ্ছে না। [রাজা থামলেন, তাকা-তিকির মুখের দিকে পলক তাকালেন]

তাকা ও তিকি আরও কিছু শোনার আগ্রহ নিয়ে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাজা ॥ [সে-কথায় আর না-গিয়ে, এদিক-ওদিক দেখে] বাড়িতে আর কাউকে দেখছি না ? তোমরা একা ?

তাকা ॥ আমার এক কাকা আছেন। এখনও ফেরেননি।

বাজের শব্দ।

রাজা ॥ [বাজের শব্দ শুনে] দেখেছ, কী সাংঘাতিক গর্জন ! [তিকির দিকে চোখ রেখে] তোমার বোন ?

তাকা ॥ হ্যাঁ, তিকি।

রাজা ॥ তুমি ?

তাকা ॥ তাকা।

রাজা ॥ তোমাদের মা-বাবা এখানে থাকেন না ?

তাকা ও তিকি দুজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কোনও উত্তর দিল না।

রাজা ॥ [বুঝতে পেরে, দুঃখে] ওঃ ! [তিকিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে] আমার কাছে এসো !

তিকি ভয়ে-ভয়ে ধীর-পায়ে রাজার কাছে এগিয়ে গেল।

রাজা ॥ তুমি দাদাকে ভালবাস ?

তিকি দাদার দিকে তাকাল। একটু হাসল। মুখে না-বলে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

রাজা ॥ [মজা করে] খু-উ-ব ?

তিকি হেসে ফেলল। তাকাও হাসল।

রাজা ॥ আমাকে ?

তিকি ও তাকা দুজনেই অবাক হয়ে থমকে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তিকি তাকিয়ে-তাকিয়ে ডান পায়ের বুড়ো-আঙুল দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ঘরের মেঝেটা খুঁটতে লাগল।

রাজা ॥ [ওদের চুপ করে থাকতে দেখে] সত্যিই তো আমাকে চেন না, কিছু না, আমাকে কেমন করে ভালবাসবে ! [হেসে ফেললেন। তিকিকে কাছে টেনে আদর করলেন] আমি কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসি !

তিকি ॥ [নরম গলায়] আপনিও আমাদের চেনেন না।

রাজা ॥ [হেসে] চিনি, চিনি ! এই দুর্যোগের রাতে যখনই আমার মতো একজন অচেনা মানুষকে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছ, তখনই আমি তোমাদের চিনে ফেলেছি। [একটু থামলেন। আলখাল্লার ভেতরের পকেট থেকে একটা মণিহার বার করে] এটা তোমার জন্যে।

তিকি ॥ [অবাক চোখে দেখে] কী ?

রাজা ॥ [পরাতে যাবেন] পরো !

তিকি ॥ [বাধা দিয়ে] না, না। কাকা বকবে।

রাজা ॥ [জোর করে পরিয়ে দিয়ে] বাঃ ! চমৎকার মানিয়েছে।

তিকি ॥ [ভয়ে দাদার কাছে ছুটে গিয়ে] দাদা !

তাকা ॥ [তিকির গলার হারটার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর রাজার দিকে চেয়ে] তিকির গলায় এই হারটা দেখলে, কাকা কেড়ে নেবে !

রাজা ॥ [সহজ সুরে] কিচ্ছু বলবেন না। আমায় একটু জল দাও দিকি। তেষ্টা পেয়েছে।

তাকা ও তিকি দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাকা ইশারায় সেই চৌকির নীচে রাখা নাড়ুদুটো তিকিকে আনতে বলল। নিজে কলসি থেকে জল গড়াতে গেল।

রাজা ॥ [দেখে, ব্যস্ত হয়ে] না, না, পারবে না। দাও, আমি গড়িয়ে নিচ্ছি।

তাকা ॥ না, আমি পারি। আপনি বসুন।

জল গড়াল তাকা। তিকি নাড়ুদুটো বাটিতে নিয়ে রাজার কাছে এগিয়ে গেল। তাকা জলের গেলাস নিয়ে পাশে দাঁড়াল।

রাজা ॥ [তিকির হাতে নাড়ু দেখে] এ কী এনেছ ?

তাকা ॥ মা বলে গেছে, বাড়িতে অতিথি এলে শুধু জল দিতে নেই।

রাজা ॥ [হাসতে-হাসতে] আচ্ছা ! কিন্তু আমার মা আবার বলে গেছে কারও বাড়িতে গিয়ে অন্যের খাবার হ্যাংলার মতো গিলে এসো না। তিকির হাতের বাটি থেকে একটা নাড়ু তুলে নিয়ে, তিকির মুখের কাছে এনে] নাও !

তিকি ॥ [মুখ সরিয়ে নিয়ে] না, না, আপনি খান !

রাজা ॥ [হাসতে-হাসতে, তিকির হাত ধরে পীড়াপীড়ি করে] না-খেলে আমি খাব না।

যখন পরস্পরকে খাওয়াবার জন্যে চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই বাইরের দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল। তাকা, তিকি ও রাজা চমকে তিনজনে প্রায় একসঙ্গে দরজার দিকে দৃষ্টি দিল।

তাকা ॥ [থমথমে মুখে] এবার পাণ্ডাকাকা।

বাইরে থেকে চিৎকার— দরজা খোল্ !

তিকি ॥ [মুখ চুমসে] খুলে দে !

তাকা ঝটপট দরজা খুলে দিল। রাজার জল অথবা নাড়ু খাওয়া হল না। তিকি তাড়াতাড়ি নাড়ুর বাটিটা জলের কলসির আড়ালে রেখে দিল। কেননা, চৌকির নীচে রাখার সে সুযোগ পেল না। জলের গেলাসটা দরজা খুলতে যাবার আগেই তাকা তিকির হাতে দিয়েছিল। তিকি সেটাও কলসির কাছে রেখে দিল। পাণ্ডা ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে রাজা উঠে দাঁড়ালেন। পুঁটলিটা হাতে নিলেন। পাণ্ডা গজগজ করে এগিয়ে এল। রাজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। চিনতে পারলেন এবং বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পাণ্ডা ॥ [ভয় ও চাপা আনন্দ] মার দিয়া কেল্লা ! আমায় আর কে পায় ! [তারপর হঠাৎ রেগে উঠে] আমি এসব আর সহ্য করব না। [তাকা ও তিকিকে লক্ষ্য করে] এখানে তোমাদের আর স্থান হবে না। [হঠাৎ চাপা আনন্দ] ক'দিন পরে আমি যখন রাজা— [থমকে, নিজের মুখে হাতচাপা দিয়ে] না, না, এখন কিচ্ছু বলা নেই। [তারপর আবার রেগে] জঞ্জাল, জঞ্জাল। দুটোকে সাফ না করতে পারলে আমার শান্তি নেই ! [হঠাৎ ছদ্মবেশী রাজাকে দেখে শিউরে উঠে] এ কী ! আপনি কে ?

রাজা ॥ [পিঠে পুঁটলিটা রাখতে-রাখতে] আমি একজন মুসাফির।

পাণ্ডা ॥ [রুক্ষ স্বরে] রাতের অন্ধকারে অন্যের বাড়িতে কী মনে করে ?

রাজা ॥ একটু আশ্রয়ের জন্য—

পাণ্ডা ॥ [ক্ষিপ্তস্বরে] কে ঢুকতে দিল ? [তাকা ও তিকিকে] তোরা ?

রাজা ॥ এমন চমৎকার ছেলে-মেয়ে দেখিনি। ভারী দয়ালু।

পাণ্ডা ॥ [তাকার ঘাড় ধরে] হতচ্ছাড়া ! দয়া দেখাচ্ছ ! [মারতে যাবে]

রাজা ॥ [দ্রুত এগিয়ে এসে] আ-হা-হা, ও কী করছেন ?

পাণ্ডা ॥ কী করছি, সেটা আপনাকে দেখতে হবে না !

রাজা ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে ছেড়ে দিন। আমি চলে যাচ্ছি।

পাণ্ডা ॥ [মেজাজ তেমনি চড়িয়ে] হ্যাঁ চলে যান, এক্ষুনি চলে যান। দরদ দেখাচ্ছে ! বেশি বাড়াবাড়ি করলে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব !

রাজা ॥ [রুখে দাঁড়িয়ে] বলেন কী ! [হাতের ঘুসি তুলে] আপনি কি ভাবছেন আমার এটার জোর কমতি আছে ? আপনার মুখের চেহারাটা পালটে দিতে একটি ঘুসিই যথেষ্ট।

পাণ্ডা ॥ [পলকে তাকার ঘাড় ছেড়ে রাজাকে ধাক্কা দিল] যান, বেরিয়ে যান।

রাজা ॥ উঁ ! তাই নাকি ! ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তবে বলে যাচ্ছি, আপনার সময় হয়ে এসেছে। আমার গায়ে হাত তোলার ফল পেতে আপনার দেরি হবে না।

রাজা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

পাণ্ডা ॥ [আস্ফালন করে] হ্যাঁ, হ্যাঁ ! অনেক দেখা আছে ! আমার নাম পাণ্ডা। কত গেল, কত এল, উনি আমায় চোখ রাঙান ! [তাকা ও তিকিকে তেড়ে উঠে] এই তোরা ! মেরে হাড় ভেঙে দেব। কেন লোকটাকে ঢুকতে দিয়েছিলি ? [হঠাৎ তিকির গলার মণিহারটা দেখতে পেয়ে] এঃ ! [হাত দিয়ে দেখে] কোথা পেলি ?

তিকি ও তাকা দুজনেই হকচকিয়ে গেছে। কারও মুখেই কথা নেই।

পাণ্ডা ॥ [গলা দ্বিগুণ চড়িয়ে] কোথা পেলি ? এটা তো আমার বাক্সে ছিল।

তিকি ॥ [ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে] না ! আমায় দিয়েছে !

পাণ্ডা ॥ [ধমক দিয়ে] চোপ্ ! চোর কোথাকার ! [জোর করে খুলে নিয়ে] ওকে দিয়েছে ! [কোমরে গুঁজে ফেলল]

তিকি ॥ [হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল] তুমি আমাদের সব নিয়ে নিচ্ছ কেন ?

পাণ্ডা ॥ [স্পর্ধা দেখে থতমত খেয়ে, তারপর সামলে] আস্পর্দা তো কম নয়। কাকে কী বলছিস ?

তিকি ॥ [অভিযোগের সুরে] তুমি তো ! তুমি তো আমাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছ। খেতে দেবে না। মারবে। আর খালি বলবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। কেন ?

পাণ্ডা ॥ [অপ্রস্তুত হয়ে] বলে কী !

তাকা ॥ কেন বেরিয়ে যাব ? এ-বাড়ি তো আমাদের। আমরা ছোট বলে বাবা তোমাকে দেখতে বলে গেছে।

পাণ্ডা ॥ [রাগে ফেটে পড়ে] বটে ! দেখতে বলে গেছে ! না, আমি তোদের দয়া করে থাকতে দিয়েছি ? শুনে রাখ, এ-বাড়ি আমার ! [তাকাকে ধাক্কা দিয়ে] যাঃ ! দূর হয়ে—

ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাকা ছিটকে পড়ল। অমনি সেই ধাক্কায় পাণ্ডার ট্যাঁক থেকে রত্ন-ভাণ্ডারের চাবিটাও ঠং করে মেঝের ওপর গড়িয়ে ছিটকে গেল। পাণ্ডার কথা শেষ হল না। থতমত খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চাবিটা তুলে নিয়ে, একবার তাকার দিকে আর একবার তিকির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। তাকা আর তিকি দুজনেই চাবিটা দেখে ফেলেছে। কিন্তু পাণ্ডা ওদের দিকে তাকানোর সঙ্গে-সঙ্গে ওরা ভয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই ঘটনা ঘটল। কয়েক সেকেণ্ড উৎকণ্ঠা। কিন্তু পাণ্ডা ওদের হাবভাব দেখে আর সন্দেহ করল না।

পাণ্ডা ॥ [আবার চিৎকার করে, বিছানার দিকে এগোতে-এগোতে] যদি তোদের দূর করতে না-পারি তো আমার নাম পাণ্ডা নয়। [বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের নীচে চাবিটা লুকিয়ে রাখতে-রাখতে আবার একবার মুখ ঘুরিয়ে পিছনে দেখল। চাবি রাখল। তারপর তিকির দিকে তেড়ে এল] অমন ড্যাবড্যাব করে কী দেখছিস ?

তিকি ॥ [মুখে-চোখে রাগ] তুমি আমার হারটা ফেরত দেবে কি না ?

পাণ্ডা ॥ না দিলে মারবি ?

তিকি ॥ না-দিলে বলে দেব।

পাণ্ডা ॥ [একটু ঘাবড়ে গিয়ে] কী বলে দিবি ?

তিকি ॥ চাবির কথা !

পাণ্ডা ॥ [চমকে] অ্যাঁ !

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

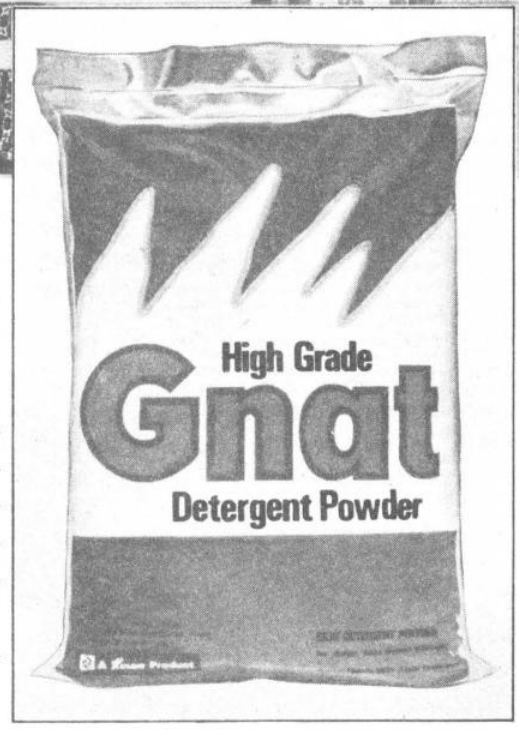

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি–

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

তিকি ॥ রত্ন-ভাণ্ডারের চাবি তুমি চুরি করেছ !

পাণ্ডা ॥[একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে] কী বললি ! [সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এসে তিকির গলাটা টিপে ধরল] তোকে মেরে ফেলব আমি !

তিকি ॥ [রুদ্ধ গলায়] আ-আ-আ !

তাকা ॥ [এতক্ষণ মেঝেয় পড়ে ছিল। নিমেষে ছুটে এসে পাণ্ডাকে জাপটে ধরল] ছেড়ে দাও, আমার বোনকে ছেড়ে দাও ! [তারপর চেঁচিয়ে] কে কোথায় আছ ! আমাদের মেরে ফেলল !

পাণ্ডা ॥ [চিৎকার শুনে, তিকির গলা ছেড়ে, তাকাকে ঝাপটা মেরে ফেলে দিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে] বেয়াদপ ! আমার নুন খেয়ে আমার গায়ে হাত দিস ! [ভয়ংকর ভঙ্গিতে ছটফট করে] এবার তোদের কাটব আমি ! কাটারিটা কোথায় গেল ! [খুঁজতে-খুঁজতে চেঁচাতে লাগল] কাটারিটা ? দাঁড়া ! ও ঘরে আছে বোধহয় ! নিয়ে আসছি। [প্রচণ্ড দাপাদাপি করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তার গলার হুঙ্কার ও ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে]

নিমেষে তাকা ছুটে গেল বিছানাটার কাছে। ঝট করে বালিশটা উলটে চাবিটা নিয়ে, ছুটে এল তিকির কাছে।

তাকা ॥ [তিকির হাত ধরে, উত্তেজক গলায় অথচ চাপা স্বরে] চ' তিকি, পালিয়ে চ'। [দুজনে ছুটে দরজা ডিঙিয়ে পালাল]

তখনও অন্য ঘরে পাণ্ডার আস্ফালন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা বেরিয়ে যাবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাণ্ডা চিৎকার করতে-করতেই ঢুকল।

পাণ্ডা ॥ [হাতে দড়ি] তোদের লম্ফঝম্ফ বার করছি] আগে তোদের বাঁধব। তারপর কাটব। তারপর— [দেখতে না-পেয়ে থমকে গেল] উঁ ! কী ব্যাপার ! কোথা গেল ! [দরজার দিকে চেয়ে] খোলা ! [বিছানার দিকে চেয়ে] এ কী ! [পড়ি-মরি বিছানার কাছে ছুটে গেল] চাবি নিয়ে পালিয়েছে ! [পাগলের মতো বিছানা উলটে-পালটে, চিৎকার করে দরজা ডিঙিয়ে ছুট দিল] শয়তান চাবি নিয়ে পালিয়েছে ! ধর ! ধর !

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর বন। অন্ধকার। রাত্রি। নির্জন। গাছের অস্পষ্ট ছায়া। ঝিঁঝির ডাক। পাতার খসখসানি। পাখির ঝটপটানি। সেই বনে ছুটতে ছুটতে তাকা ও তিকি ঢুকল। তারা যেন আর ছুটতে পারছে না। দাঁড়াল। ক্লান্ত। হাঁফাচ্ছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তাকা একটা গাছকে আঁকড়ে ধরল। তিকি দু' হাতের ওপর ভর দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল।

তাকা ॥ [হাঁফাতে হাঁফাতে] আর পারছি না।

তিকি ॥ [হাঁফাতে হাঁফাতে] কোথায় এলুম ? [চারিদিকে চোখ বুলিয়ে] কী ভীষণ অন্ধকার দেখেছিস !

তাকা ॥ [ভাল করে দেখার চেষ্টা করে] মনে হচ্ছে, বনের অনেকটা ভেতরে চলে এসেছি।

তাকা ও তিকি ছুটে আসার ধকলটা ধীরে ধীরে সামলে উঠছে। একটু নিস্তব্ধতা।

তিকি ॥ [হঠাৎ মনে পড়ায় চমকে] চাবি !

তাকা ॥ [জামার পকেটে তড়িঘড়ি হাত দিয়ে, আশ্বস্ত হয়ে] আছে !

তিকি ॥ কই ?

তাকা ॥ এই যে ! [বার করল]

তিকি ॥ [হাতে নিয়ে] এটা যদি রত্ন-ভাণ্ডারের চাবি না হয় !

তাকা ॥ [অন্ধকার বলে চাবিটা চোখের একেবারে কাছে এনে] দেখি ! [দেখতে দেখতে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটাই। এই দ্যাখ না, চাবিটার গায়ে রাজার মুকুটের ছাপ।

ঠিক এই সময় হঠাৎ দূর থেকে পাণ্ডার গলার ডাক শোনা গেল।

পাণ্ডা ॥ [রুক্ষ মেজাজে চেঁচিয়ে] তাকা, এই তিকি।

তাকা ও তিকি দুজনেই ভয়ে থতমত খেয়ে গেল। আবার পাণ্ডার গলায় ডাক শোনা গেল। এবার দূর থেকে কাছে এগিয়ে এসেছে সেই ডাক।

তাকা ॥ [ঝট করে চাবিটা পকেটে লুকিয়ে ফেলে তিকির হাত ধরল। তারপর ছুটতে ছুটতে] পাণ্ডাকাকা আসছে ! চ', পালাই !

তাকা ও তিকি ছুটে পালাল। আর প্রায় ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডা ঢুকল।

পাণ্ডা ॥ [চিৎকার করে] তাকা— ! [নিজের মনে রেগে গজগজ করতে করতে উঁচু গলায়] যদি ধরতে পারি, তোদের মুণ্ডুপাত করে ছাড়ব। যদি বাঁচতে চাস, বেরিয়ে আয় ! তাকা— !

হঠাৎ একটা গলা-খাঁকারির শব্দ : উঁঃ-হুঁঃ, উঁঃ-হুঁ। পাণ্ডা যেদিক দিয়ে ঢুকল, দেখা গেল, ঠিক তার উলটো দিক থেকে একজন বুড়োমানুষ কাসতে কাসতে ঢুকল। তার হাতে একটা লণ্ঠন। পাকা দাড়ি। উসকো-খুসকো ঝাঁকড়া-চুল। গায়ে কুর্তা। পরনে পাজামা।

বুড়ো ॥ [এগিয়ে এসে, পাণ্ডার মুখের কাছে আলো ধরে] কে মশাই আপনি ? চেঁচামেচি করে আমার সুখের ঘুমটাকে ফুঁকে দিলেন ?

পাণ্ডা ॥ [হঠাৎ বুড়োকে দেখে, হকচকিয়ে] আমি, মানে দুটো ডাকাত এদিক দিয়ে—

বুড়ো ॥ [আশ্চর্য হয়ে] আপনি, মানে দুটো ডাকাত এদিক দিয়ে—

পাণ্ডা ॥ [আমতা-আমতা] মানে, সোনা—

বুড়ো ॥ যাচ্চলে ! কী বলছেন, কিছুই বুঝছি না। একটু খোলসা করে বলা যায় না ?

পাণ্ডা ॥ [ঢোঁক গিলে] মানে, দুটো খুদে ডাকাত আমার সোনা চুরি করে ভেগেছে ! [এবার ক্ষিপ্ত হয়ে] দুটোকে যদি ধরতে পারি একদম কেটে ফেলব।

বুড়ো ॥ [দু'পা পিছনে ছিটকে] দাঁড়ান, দাঁড়ান, এমন হাত-পা ছুঁড়ছেন, যেন আমাকেই কেটে ফেলবেন। অন্ধকার বনের ভেতর অমন অস্থির হয়ে চিল্লাচিল্লি করলে, কোন্ ফাঁকে আপনাকেই কেউ ফাঁকা করে দেবে। বন-বাদাড় বড় বদ জায়গা মশাই ! যাক, বলুন তো, ডাকাত দুটোকে আপনি এই বনের ভেতর ঢুকতে দেখেছেন ?

পাণ্ডা ॥ তা ছাড়া যাবে কোথায় ?

বুড়ো ॥ [আশ্বাসের স্বরে] তা যদি হয়, ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি !

পাণ্ডা ॥ [অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে] আপনি ?

বুড়ো ॥ বিশ্বাস হচ্ছে না ?

পাণ্ডা ॥ কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।

বুড়ো ॥ এই তো ! কিছু খেতে না দিয়েই, মুখ ধুয়ে ফেলতে বলছেন ! হে-হে-হে !

পাণ্ডা ॥ [থমকে] মানে !

বুড়ো ॥ আমি যে আপনার হয়ে খাটব, আমি কী পাব ?

পাণ্ডা ॥ [আশ্বাস দেওয়ার ভান করে] পাবেন বইকী !

বুড়ো ॥ [ঠাণ্ডা মেজাজে] কী সেটা শুনে রাখা ভাল নয় কি ? দেখুন, পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারটা আগেই ফয়সালা করে রাখা ভাল। পরে আবার কী ঝামেলা হয়। ঝামেলা আমার একদম ধাতে সয় না।

পাণ্ডা ॥ বেশ তো, আপনার কী চাই বলুন !

বুড়ো ॥ [হঠাৎ পাণ্ডার কোমরের দিকে ইঙ্গিত করে] ওটা কী, ওটা ?

পাণ্ডা ॥ [কোমরের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেছে। দেখা গেল, তিকির গলা থেকে খুলে নিয়ে যে-মণিহারটা সে কোমরের কাপড়ে গুঁজে রেখেছিল, সেই হারের খানিকটা বাইরে বেরিয়ে ঝুলে আছে। অন্ধকারে দু-একটা মণি ঝকঝক করছে। তাড়াতাড়ি সেই মণিহারটা আবার কোমরে ভাল করে গুঁজতে-গুঁজতে] না, এটা কিছু নয় !

বুড়ো ॥ দেখান না ! ওটাতেই যদি আমার পাওনাটা মিটে যায় !

পাণ্ডা ॥ এটা একটা ফালতু জিনিস !

বুড়ো ॥ ওইটাই দিন। আমার এক নাতনি আছে, তাকে দেব, খুব খুশি হবে !

পাণ্ডা ॥ [অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, একটু ভাবল। তারপর চোখ মটকে আপন মনে বলল] ঠিক আছে, রাজি হয়ে যাই। আগে তো কাজটা হাসিল হোক। রত্ন-ভাণ্ডারে এমন হার কত আছে। চাবিটা পেলে সব আমারই তো হবে।

বুড়ো ॥ কী ভাবছেন ?

পাণ্ডা ॥ [ঝট করে হারটা কোমর থেকে বার করে] এই নিন !

বুড়ো ॥ দিচ্ছেন ? [হাতে নিল]

পাণ্ডা ॥ তা হলে এবার ধরে দিন।

বুড়ো ॥ নিশ্চয়ই। [হারটা কোমরে গুঁজতে-গুঁজতে] আপনাকে কিন্তু একটু আড়ালে থাকতে হবে।

পাণ্ডা ॥ চারদিকে অন্ধকার যে !

বুড়ো ॥ অন্ধকারেই তো মজা। ঘাপটি মেরে বসে থাকবেন।

পাণ্ডা ॥ [আশঙ্কা করে] তারপর আপনি ?

বুড়ো ॥ ডাকাত ধরে যেই হাঁকার দেব, যেখানেই থাকুন সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে পড়বেন। আমি তো একা ! বুড়ো মানুষ। বুঝছেন তো !

পাণ্ডা ॥ ঠিক আছে।

বুড়ো ॥ তা হলে আপনি ওদিকে যান, আমি এদিকে যাই।

পাণ্ডা ॥ [উত্তেজনায়] ঠিক আছে।

পাণ্ডা আর বুড়ো লোকটা একই সঙ্গে দুজন দুদিকে চলে গেল। এখন ভয়ংকর নিস্তব্ধ চারদিক। বুড়ো লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে জমাট অন্ধকার। হঠাৎ দেখা গেল সেই অন্ধকারে তাকা আর তিকি গুঁড়িসুড়ি মেরে ঢুকছে। ভীষণ উৎকণ্ঠা।

তিকি ॥ [ভয়মেশানো চাপা স্বর] কী হবে ?

তাকা ॥ [একইভাবে চাপা স্বরে] একটা বুড়ো আমাদের ধরে দেবে বলে, পাণ্ডাকাকার কাছ থেকে তোর সেই হারটা নিল।

তিকি ॥ পালিয়ে চ' !

তাকা ॥ যাবার রাস্তা নেই। দু'দিক দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলেছে !

তিকি ॥ [ব্যস্ত হয়ে] তবে চ', ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি।

তাকা ॥ সেই ভাল ! [হাত ধরে, চটপট ছুটে] তাই চ'।

ওদের ছোটা হল না। কেননা এতক্ষণ ওদের নজরে পড়েনি, ওরা এখানে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে পাণ্ডা ওদের দেখতে পেয়ে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওরা যেই পালাতে গেল, মুহূর্তে পাণ্ডা ওদের সামনে লাফিয়ে পড়ল।

পাণ্ডা ॥ [লাফিয়ে সামনে এসে] এবার ! [শয়তানের মতো হেসে] হা-হা-হা !

তাকা আর তিকি দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পাণ্ডা ॥ [কটমট করে তাকিয়ে] ভাবছিস পালিয়ে পার পেয়ে যাবি ! চাবি কই ?

তাকা হঠাৎ তিকির হাত ধরে ছুট দিতে গেল।

তাকা ॥ তিকি, পালিয়ে আয় !

পাণ্ডা ॥ [পলক পড়ার আগেই তিকিকে ধরে ফেলল] শয়তান, পালাবি কোথায় ? তোর গলা টিপে মেরে ফেলব !

তিকি ॥ [কেঁদে উঠেছে] দাদা !

তাকা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পাণ্ডা ॥ [তাকাকে] চাবি কই ? দে, নইলে তোর বোনকে মেরে ফেলব।

তাকা ॥ এ-চাবি তোমার নয়। এ-চাবি রাজার রত্ন-ভাণ্ডারের। এ-চাবি আমরা রাজাকে ফেরত দেব।

পাণ্ডা ॥ [হুঙ্কার দিয়ে] চাবি আমার। আমাকে না দিলে তোর বোনকে মেরে ফেলব। [গলাটা টেপার ভঙ্গি করল]

তাকা ॥ [চিৎকার করে] না— !

পাণ্ডা ॥ তবে দে !

তাকা ॥ তুমি আমার বোনকে ছেড়ে দাও !

পাণ্ডা ॥ তোর হুকুমে ?

তাকা ॥ [চোখের নিমেষে পাণ্ডার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে] হ্যাঁ !

পাণ্ডা আচমকা ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে পারল না। সেই ফাঁকে তিকিও পাণ্ডার পিঠে কিল-চড় চালাতে শুরু করে দিল। পাণ্ডা ধাক্কাটা সামলে নিয়েই তিকিকে ঠেলে ফেলে দিল। তিকি মুখ থুবড়ে পড়ল, আর উঠতে পারল না। তারপর তাকার কাছ থেকে চাবিটা কেড়ে নেবার জন্যে ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দিল। তাকাও ছাড়ে না। লড়ে যায় পাণ্ডার সঙ্গে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না। শেষে পাণ্ডা তাকার কাছ থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে লম্ফঝম্ফ ও হাঁকডাক শুরু করে দিল। তাকাকে বেশ করে কষে জড়িয়ে ধরে, তার কোমরের কাপড়টা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে।

পাণ্ডা ॥ [বেঁধে] থাক পড়ে। পড়ে পড়ে মরবি। [তিকির দিকে দেখে] আমার এক ঘায়েই তোর বোনটা মরেছে। এবার তিলে তিলে তুই মর।

পাণ্ডা পালাল।

তাকা ॥ [চিৎকার করে ওঠে] বাঁচাও ! বাঁচাও ! [কারও সাড়া পেল না। নজর পড়ল তিকির দিকে। খুব কষ্ট করে ধীরে ধীরে ডাকল] তিকি ! [সাড়া পেল না] এই তিকি ! [তবু সাড়া পেল না। অস্থির হয়ে] তোর কী হয়েছে তিকি ? [তিকির ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। হঠাৎ চিৎকার করে] তিকি— !

তাকা বাঁধন খুলে ফেলার জন্যে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু কিছুই হল না। তখন তাকা সেই বাঁধা অবস্থায় গড়াতে গড়াতে অনেক কষ্টে তিকির কাছে পৌঁছল। ঠিক সেই সময় তিকির হাত-পা যেন একটু-একটু নড়ে উঠল।

তাকা ॥ [কষ্ট অগ্রাহ্য করে, একটু খুশিতে ঝলসে উঠে] তিকি !

তিকি ॥ [কষ্ট করে] দাদা ! [অস্পষ্ট স্বর]

হঠাৎ পাখি ডেকে উঠল গাছে। ভোর হচ্ছে। গাছের ফাঁকে আলোর ঝিলিমিলি দেখা যাচ্ছে।

তাকা ॥ তিকি, ভোর হয়ে গেছে। দ্যাখ, দ্যাখ কত পাখি !

তিকি ॥ [এবার স্পষ্ট করে চোখ চাইল। আকাশটা দেখল। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে বসল। দাদাকে দেখল। আঁতকে উঠল] এ কী ! তোর কী হয়েছে দাদা ?

তাকা ॥ পাণ্ডাকাকা।

তিকি ॥ [ব্যস্ত হয়ে] তোকে এমনি করে বেঁধে গেছে ! [বাঁধন খুলবার চেষ্টা]

তাকা ॥ তোকেও তো অমন করে ফেলে গেছে !

তিকি ॥ [বাঁধন খুলে ফেলে] দাদা ! [আনন্দ]

তাকা ॥ [আনন্দে বাঁধনের কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে] তিকি !

তিকি ॥ আর না। পালিয়ে চ'।

তাকা ॥ কোথায় যাই ?

তিকি উঠে দাঁড়াল অমনি হঠাৎ অনেক ঘোড়ার একসঙ্গে ছুটে আসার খুরের শব্দ। দূর থেকে কাছে ভেসে আসছে। তাকা ও তিকি দুজনেই চমকে চাইল।

তিকি ॥ দাদা, দ্যাখ, দ্যাখ, ঘোড়ার পিঠে একদল পল্টন ছুটে আসছে !

তাকা ॥ [ভয়ে] কেন বল তো ?

তাকা ও তিকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়ার খুরের শব্দ দূর থেকে কাছে এসে থামল। একদল পল্টন, তালে-তালে পা ফেলে সেখানে ঢুকল। তাদের মাথায় পাগড়ি, একই ঢঙ। গায়ে মোটা কুর্তা, একই রঙ। পরনে চোস্ত পাজামা, সাদা। কোমরে ফেট্টি বাঁধা। খাপে তলোয়ার। পায়ে শক্ত নাগরা। বুকে নানান তকমা আঁটা। পল্টনদের যে সর্দার, সে এগিয়ে এল।

সর্দার ॥ তোমাদের নাম ?

তাকা ॥ [খানিকটা ভয় মেশানো গলায়] তাকা। আর এ আমার বোন তিকি।

সর্দার ॥ আমরা রাজসৈন্য। তোমাদের রাজবাড়িতে যেতে হবে।

তাকা ॥ [ভয়ে-ভয়ে] কেন ?

সর্দার ॥ সেটা আমাদের জানা নেই ! ভাল কথায় যদি না যাও, তো ধরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।

তাকা ॥ আমরা তো কোনও দোষ করিনি !

সর্দার ॥ তার বিচার করবেন রাজমশাই।

তিকি ॥[দাদাকে কাছে সরিয়ে এনে] দাদা, কথা শোনাই ভাল।

তাকা ॥ ঠিক বলেছিস। [সর্দারকে] বেশ, আমরা যাব। চলুন।

তাকা ও তিকিকে সঙ্গে নিয়ে সেনারা বেরিয়ে গেল। ঘোড়া ডেকে উঠল। ছুটল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

দেখা যাচ্ছে, রত্ন-ভাণ্ডারে প্রবেশ করার ফটক। রক্ষীরা সতর্ক পায়ে, চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে ফটক পাহারা দিচ্ছে।

প্রথম রক্ষী ॥ [হঠাৎ থেমে] চাবি না-পাওয়া গেলে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে রত্ন-ভাণ্ডারে ঢুকতে হবে।

দ্বিতীয় রক্ষী ॥ কাজটা বলা যত সহজ, করা তত সহজ কি ?

তৃতীয় রক্ষী ॥ যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

চতুর্থ রক্ষী ॥ শুনেছি, চাবিটা খুঁজে বার করার জন্যে রাজা স্বয়ং ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়েছেন।

দ্বিতীয় রক্ষী ॥ আরে বাবা, খুঁজে বার করাটাও কি অতই সোজা।

প্রথম রক্ষী ॥ তা ঠিক।

চতুর্থ রক্ষী ॥ আমাদেরই যত ঝামেলা। চব্বিশ ঘণ্টা রত্ন-ভাণ্ডারের ওপর নজর রাখো।

তৃতীয় রক্ষী ॥ [সতর্ক হয়ে] চুপ !

চতুর্থ রক্ষী ॥ কী ! [উৎকণ্ঠা]

তৃতীয় রক্ষী ॥ শোন্ ! [সন্দেহ]

প্রথম রক্ষী ॥ [একসঙ্গে চাপাস্বরে] পায়ের শব্দ !

দ্বিতীয় রক্ষী ॥ [উৎকণ্ঠায়] কেউ আসছে মনে হয় ! আয়, আড়াল থেকে দেখি !

চারজন রক্ষীই চার কোণে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। পেছন দিক থেকে দেখা গেল অত্যন্ত সন্তর্পণে পাণ্ডা ঢুকছে। চোরের মতো দৃষ্টি রেখে সে এদিক-ওদিক দেখছে। এক-পা, এক-পা করে এগিয়ে আসছে। দাঁড়াল। পিছু ফিরল। রত্ন-ভাণ্ডারের ফটকের দিকে তাকাল। যখন তার মনে হল, কাছে-পিঠে কেউ নেই, কোমর থেকে চাবিটা বার করল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার সারা শরীর কাঁপছে। এবার সে সাবধানী পায়ে এগিয়ে চলল রত্ন-ভাণ্ডারের ফটকের দিকে। ফটকের কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াল। তারপর চাবিটা ফটকে যেই লাগাল, সঙ্গে সঙ্গে একজন রক্ষী একদিকের

সামনের কোণ থেকে বর্শা উঁচিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। তাকে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাণ্ডা যেদিক দিয়ে পালাতে গেল, সেদিকে আর একজন রক্ষী বর্শা উঁচিয়ে তার পথ আটকাল। এমনি করে চারদিকের চার কোণ দিয়ে পালাতে গিয়ে সে রক্ষীদের বর্শার নিশানায় আটকে পড়ে ধরা দিল। তার হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নেওয়া হল। মুহূর্তের মধ্যে আচমকা রাজা, মন্ত্রী ও পাত্র-মিত্র সভাসদদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন। সকলেই নির্দিষ্ট এক-এক জায়গায় দাঁড়ালেন। রাজাকে দেখে পাণ্ডার চোখ বিস্ফারিত। সে হতবাক। একজন রক্ষী চাবিটি রাজার হাতে দিল।

রাজা ॥ [পাণ্ডাকে উদ্দেশ করে] আশা করি আমায় চিনতে পেরেছেন ?

পাণ্ডা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রাজা ॥ আমিই সেই মুসাফির। [পাণ্ডার কাছে এগিয়ে গিয়ে] ভাল করে দেখুন তো, মনে হয় কি, এই মানুষটাই বনের সেই বুড়ো মানুষ ! [হঠাৎ হারটা বার করে] এই হারটা ডাকাত ধরে দেওয়ার জন্য আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে আপনার ? কী, চুপ করে আছেন যে ! এই হার আমি আপনার বন্ধুর মেয়েকে দিয়েছিলুম। কারণ আপনার বন্ধুর ছেলে-মেয়ে, কালকের সেই দুর্যোগের রাতে তাদের ঘরে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তারা ভয় পায়নি আমাকে। তারা বাঁচাতে চেয়েছিল আমার প্রাণ। আর আপনি লোভী, নিষ্ঠুর এমন এক মানুষ, সেই সোনার টুকরো ছেলে-মেয়ে দুটিকে মার-ধর করে, তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে, বাড়িটা হাত করতে চেয়েছিলেন। আপনি এমনই লোভী, আমার রত্ন-ভাণ্ডারের চাবিটি কুড়িয়ে পেয়েও ফেরত দেননি। না-দিয়ে রত্ন-ভাণ্ডার লুঠ করতে এসেছেন। আপনি জানেন আপনার অজান্তে গুপ্তচরের মতো আমি আপনাকে লক্ষ রাখছি। আপনি লোভে এমন নির্বোধ হয়ে গেলেন যে, একবার আপনার মনেও হল না, রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে রত্ন-ভাণ্ডার লুঠ করা যায় না। সুতরাং আপনার মতো মূর্খ লোকের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে, সারাজীবনের জন্য কারাবাস।

পাণ্ডা ॥ [মাটিতে লুটিয়ে] আমায় ক্ষমা করুন, মহারাজ !

রাজা ॥ [দৃঢ় গলায়] আমার কাছে নিষ্ঠুর, লোভী মানুষের ক্ষমা নেই। [সৈন্যদের দিকে হাত তুলে] সেই ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে আসা হয়েছে কি ?

সৈন্য ॥ হ্যাঁ হুজুর। এইমাত্র তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল।

রাজা ॥ এখানে আনো তাদের !

একজন সৈন্য বেরিয়ে গেল।

পাণ্ডা ॥ [এবার কেঁদে পড়ে] মহারাজ, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

ঠিক এই মুহূর্তে সৈনিকের সঙ্গে তাকা ও তিকি সেখানে এল। পাণ্ডা নির্বাক হয়ে গেল। তাকা ও তিকি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

রাজা ॥ [তাকা ও তিকিকে দেখে, কাছে ডেকে, নিজের দুপাশে দাঁড় করিয়ে] আমাকে আপনার চেনার দরকার নেই, এদের চিনতে পারেন কি ?

পাণ্ডা ॥ [আতঙ্কে] মহারাজ !

রাজা ॥ [মন্ত্রী, সভাসদ, সৈন্য সকলের উদ্দেশে] শুনুন আপনারা ! এই নিষ্ঠুর ঘাতক, ফুলের মতো এই শিশুদুটিকে অন্ধকার বনে হত্যা করতে চেয়েছিল। [পাণ্ডাকে উদ্দেশ করে] কী, ঠিক বলছি ?

পাণ্ডা ॥ [অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে] মহারাজ !

রাজা ॥ হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ [পাণ্ডাকে দেখিয়ে] এই লোভীর হাত থেকে রত্ন-ভাণ্ডারের চাবিটি সাহসী বীরের মতো এই দুটি শিশু উদ্ধার করে রাজবাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। [সৈন্যদের উদ্দেশে] সুতরাং যাও, একে নিয়ে যাও। কারারুদ্ধ করে রাখো।

পাণ্ডা ॥ [ছিটকে রাজার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে] মহারাজ আর কখনও করব না !

সৈন্যরা পাণ্ডাকে ধরে তুলে আনল। তাকে টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছিল। রাজা আবার হুকুম করলেন দাঁড়াতে। সৈন্যরা দাঁড়াল।

রাজা ॥ [হুকুমের ভঙ্গিতে] দাঁড়াও ! আমার আরও হুকুম শুনে যাও। তোমার বন্ধুর এই ছেলে-মেয়ে দুটি আজ থেকে থাকবে আমার কাছে। ওরা হবে রাজপুত্র, রাজকন্যা। ওরা যেদিন বড় হবে, এ-রাজত্ব হবে ওদের। আর তুমি অন্ধকার কারাগারে বসে-বসে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। [সেনাদের] যাও, লোকটাকে এবার নিয়ে যাও !

তিকি ও তাকা এতক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যে-মুহূর্তে সৈন্যরা তাকে নিয়ে যাবার জন্য ধাক্কা দিল, তিকি ছুটে এল। তাকাও পিছু নিল। পাণ্ডা কাঁদছে।

তিকি ॥ [ছুটে এসে] পাণ্ডাকাকা ! [জড়িয়ে ধরল, চোখে জল]

তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মুখে-চোখে অভিমান।

পাণ্ডা ॥ [কান্নায় ভেজা চোখ] আমি ছিলুম তোর বাবার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তোর বাবা যখন স্বর্গে চলে গেল, আমায় বলে গেল, 'আমার ছেলে-মেয়ে দুটোকে দেখো।' আমি কথা রাখিনি। আমি যে বিশ্বাসঘাতক ! শয়তান ! লোভী ! আমার জন্য কারাগারই ভাল। [তিকির মাথায় হাত রাখল]

তিকি ॥ [রাজার কাছে ছুটে গিয়ে ডুকরে কেঁদে] আমার কাকা ! [জড়িয়ে কাঁদতে লাগল]

রাজা ॥ [তিকিকে আদর করে] স্বর্গ কোথায় আছে আমার জানা নেই। আমার কাছে আজ এরই নাম স্বর্গ। [রাজার চোখও যেন ছলছলিয়ে ওঠে। নিজেকে সামলে] ওহে সৈনিকগণ, আমার হুকুম আমি ফিরিয়ে নিলুম। ওকে মুক্ত করে দাও। আর বলে দাও, একটি ছোট্ট মেয়ের কাছে যে-শিক্ষা আজ পেলে, তার সম্মান রাখতে যদি কোনওদিন ভুল হয়, তবে সেদিন হবে তোমার মৃত্যুদণ্ড ! যাও !

পাণ্ডা দণ্ডবৎ হয়ে রাজাকে প্রণাম করল। তাকা ও তিকিকে বুকে নিয়ে নিঃশব্দে কাঁদল। ওদের কপালে চুমু খেল। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে—

পাণ্ডা ॥ সুখে থাকো, সুখে থাকো !

তারপর বেরিয়ে গেল। তাকা ও তিকি সেইদিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। রাজা এগিয়ে এলেন। ওদের দুজনকে বুকে টেনে নিলেন।

রাজা ॥ [বুকে নিয়ে] আজ থেকে তোমাদের বন্ধু আমি। চলো ঘরে ফিরে যাই।

তাকা ও তিকি দুজনেই রাজার মুখের দিকে জল-ভরা চোখে চেয়ে রইল। সৈনিকেরা, সভাসদ, মন্ত্রী, সবাই হাসিমুখে চেয়ে রইলেন সেইদিকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।

—শেষ—

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ডাক্তারবাবু বলছেন

সাঁতার কাটবার আগে

শরৎকালে ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটতে চায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে নদী-নালা ভরে ওঠে, স্রোতের টান বেড়ে যায়, পুকুর হঠাৎ খুব গভীর হয়ে যায়, সেইজন্য এই সময়ে সাঁতার না-কাটাই ভাল।

শরৎকালে আবহাওয়া শান্ত থাকে,জলেও স্রোতের টান থাকে না। এই সময় সাঁতার কাটলে কোনও দুর্ঘটনার ভয় থাকে না।

সাঁতার কাটা খুব ভাল ব্যায়াম এবং ভারী ব্যায়াম। যারা খুব রোগা, তাদের সাঁতার কাটা উচিত নয়। কারণ, সাঁতার কাটার পর শরীর আরও রোগা হয়ে যাবে। শরীরে মেদ লাগবে না। শরীর থেকে মেদ ঝরিয়ে দেওয়ার জন্যই লোকে নিয়মিত সাঁতার কাটে।

সাঁতার কাটার আগে কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হবে। খুব ভাল করে সারা শরীরে তেল মেখে নিতে হবে। যে-কোনও পুকুরে সাঁতার কাটা উচিত নয়। কলকাতা শহরের পুকুরগুলোর জল খুব খারাপ, বিষাক্ত বললেও বোধহয় ভুল হবে না। ছেলেমেয়েরা এই সব পুকুরে সাঁতার কাটার সময় খানিকটা জল খেয়ে ফেলে, ফলে নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে টাইফয়েড রোগে। এদিক থেকে শহরের পুকুরের চেয়ে গ্রামের পুকুর অনেক ভাল।

এক নাগাড়ে আধঘণ্টার বেশি সাঁতার কাটা উচিত নয়। সাঁতার কাটার সময় পুকুরের জল যেন একটুও পেটে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যারা ভাল সাঁতার জানে না, তারা গাইড না নিয়ে কখনও সাঁতার কাটবে না।

সাঁতার কাটতে কাটতে পায়ে যদি ব্যথা করে সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে পড়বে। সাঁতার কাটবে না। পায়ে খিল ধরে গেলে পা নাড়তে পারবে না, ফলে বড় ধরনের বিপদে পড়ে যেতে পারো।

যে-সব পুকুরের তলায় শ্যাওলা থাকে,সে-সব পুকুরে সাঁতার না-কাটাই ভাল। কারণ শ্যাওলা লতাপাতা পায়ে জড়িয়ে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাই সাঁতার সবসময়ে সাবধানে কাটতে হয়।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

জেনে নাও

আমরা ঘামি কেন

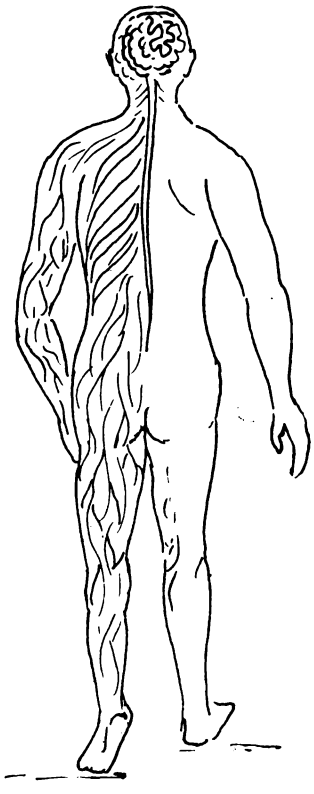

আমাদের দেহে সব সময়েই তাপ তৈরি হয়। এই তাপের কিছুটা পরিবেশে ছড়িয়ে দিয়ে আমরা দেহের উষ্ণতা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখি। তাপমোচনের স্বাভাবিক তিনটি পদ্ধতি আছে—এরা হল পরিবহণ, পরিচলন, আর বিকিরণ। দেহের উষ্ণতা যখন পরিবেশ থেকে বেশি থাকে, এই তিনটি পদ্ধতিতে তাপমোচন তখনই হয়।

কিন্তু পরিবেশের উষ্ণতা যখন বেড়ে যায়, তখন কী হয় ?

আমরা চামড়ায় অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থির সাহায্য নিই। ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘাম আমাদের চামড়ার অসংখ্য ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই ঘামে যে জলের ভাগ তা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

বাষ্প হওয়ার জন্যে তাপের দরকার। সে তাপ আসছে কোথা থেকে ? শরীর তার যোগান দেয়। ফলে দেহের তাপ হ্রাস পায়।

আমাদের শরীর থেকে ঘাম প্রায় সব সময়েই বেরিয়ে আসে। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেড়ে গেলে, ঘামে যে জলীয় উপাদান আছে, তার বাষ্পীভবন হয় কম। ফলে আমাদের চোখে ঘামটা ধরা পড়ে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব তৈ তৈ কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

মহাজন সন্দিগ্ধ চোখে সদাশিবের দিকে তাকায়।

এ-কথা জানতে চাইছে কেন ? কোনও মতলব-টতলব আছে নাকি ?

বরযাত্রীদের একজন মহাজনের দিকে চেয়ে বলল…

সেপাইকে বলতে দোষ কী ? ও তো আর গাঁয়ের পাজি লোক নয় যে ভাংচি দেবে !

হ্যাঁ গো সেপাই, শেঠজির বউ মারা গেছে তো, তাই নতুন বিয়ে করতে যাচ্ছে

বেশ, বেশ। শেঠজি দেখছি ভাগ্যবান পুরুষ। কথায় বলে, অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে।… তা কোথায় বিয়ে ?

সে অনেক দূর। আজ সারাদিন কাটবে, কাল বিকেলে গিয়ে পৌঁছবো। ডোঙরপুর গাঁয়ের নাম শুনেছ ?

ডোঙরপুর !!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বইকী ! দু'একজন লোকের নামও জানি। বিঠ্ঠল পাটিল—

আরে, ওই বিঠ্ঠল পাটিলের মেয়ের সঙ্গেই তো বিয়ে।

চমকে ওঠে সদাশিব

তার মানে ?

কুঙ্কু !!

কুঙ্কু ছাড়া তো বিঠ্ঠল পাটিলের অন্য মেয়ে নেই !

তবে কি কুঙ্কুকেই বিয়ে করতে চলেছে মহাজন ?!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

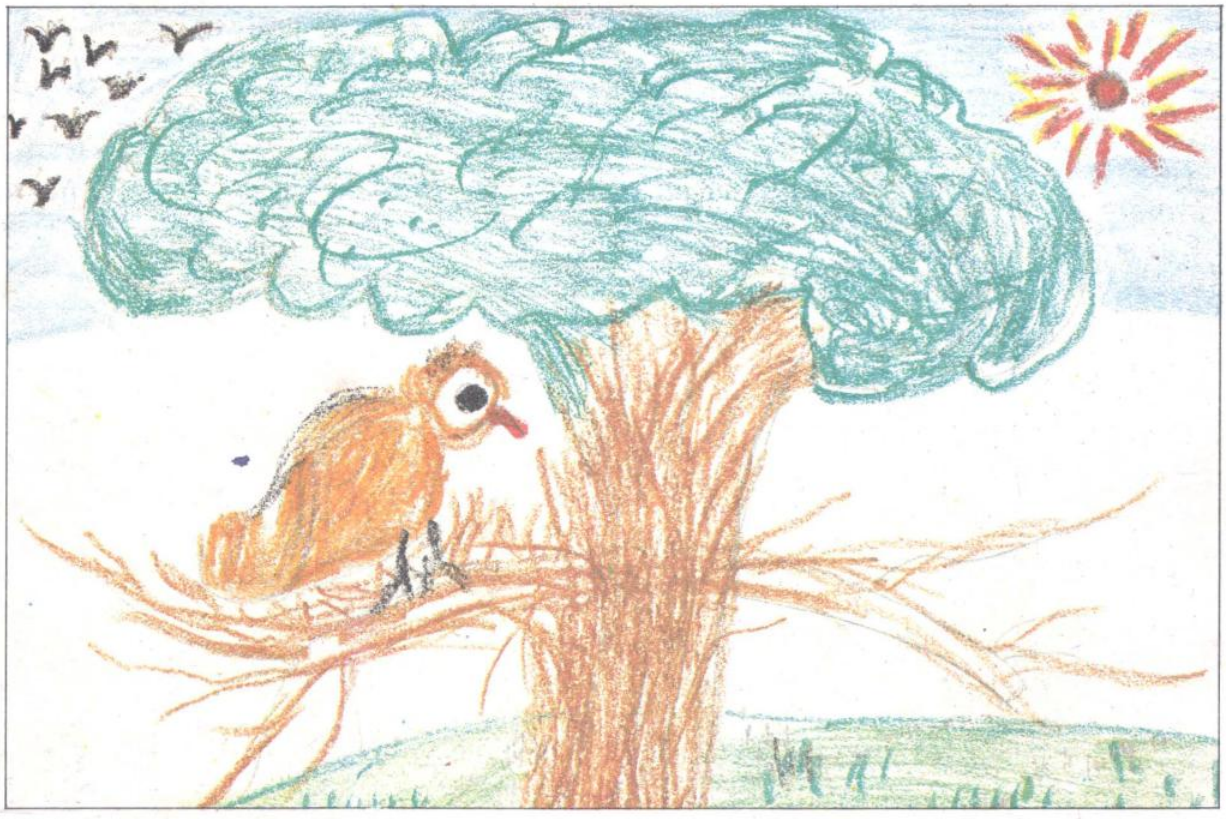

ছবি এঁকেছে **সংযুক্তা সরকার** (বয়স ৮)

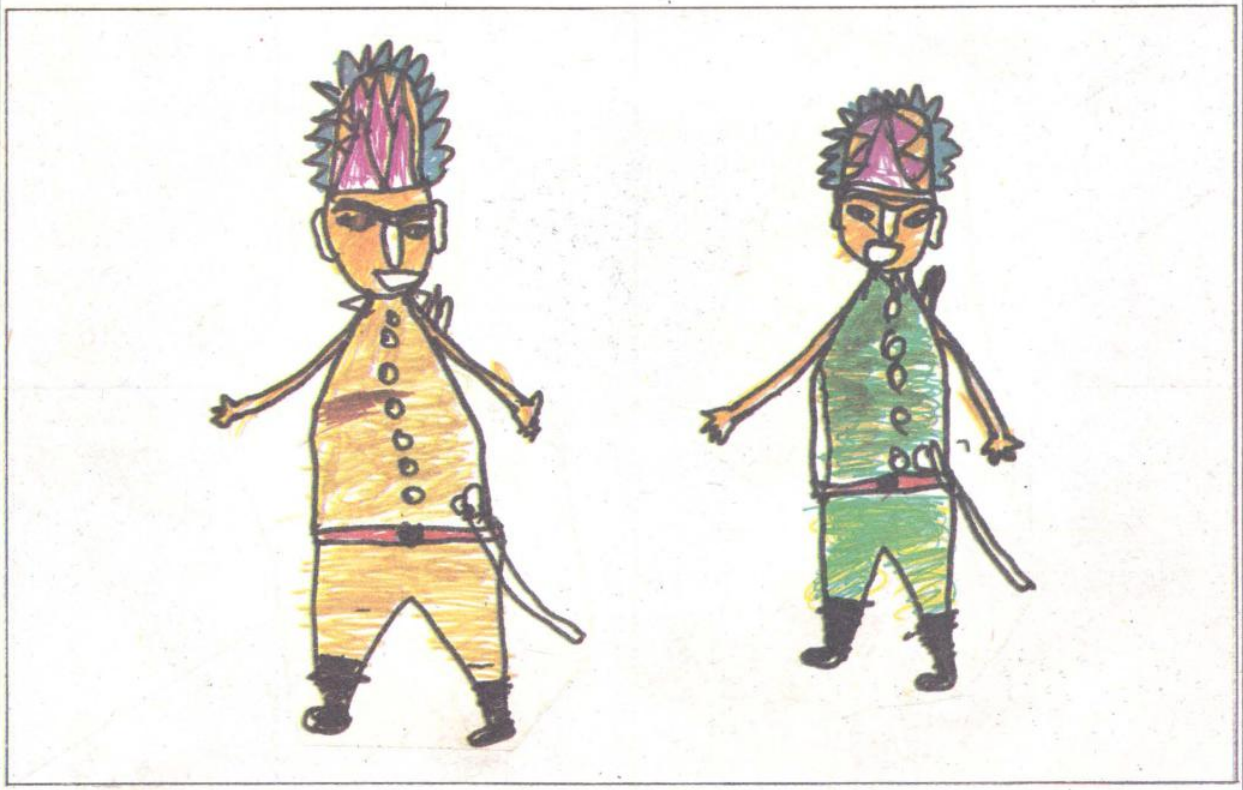

ছবি এঁকেছে **অর্ক পাল** (বয়স ৭)

অমৃতাঞ্জনের

'বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু চিনে বলুন' প্রতিযোগিতা

৩৭৫০০ টাকা মূল্যের পুরস্কার জিতে নিন !

একেবারে সোজা কাজ। এখানে পৃথিবীর ৫টি বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তুর ছবি দেওয়া হয়েছে। ঐ বিখ্যাত বস্তুগুলির নামের ১ থেকে ৫ নম্বরযুক্ত একটি তালিকাও এখানে রয়েছে। আপনাকে প্রতিটি দ্রষ্টব্য বস্তুকে তার সঠিক নামের সঙ্গে মেলাতে হবে—অর্থাৎ, প্রতিটি ছবির নিচে যে চৌখুপী দেওয়া হয়েছে তাতে সঠিক নম্বরটি বসিয়ে দিতে হবে।

এবার, নিচে চৌখুপীতে দেওয়া বাকাটি অনধিক আরো ১০টি শব্দ ব্যবহার করে সম্পূর্ণ করুন।

অমৃতাঞ্জনের ১২ গ্রাম শিশির একটি খালি কার্টন সঙ্গে দিয়ে আপনার প্রবেশপত্র পাঠিয়ে দিন। আপনি ইচ্ছে করলে এই বিজ্ঞাপনটিকেও প্রবেশপত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

তাড়াতাড়ি করুন। প্রবেশপত্র জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ই অক্টোবর।

অমৃতাঞ্জন পেইন বাম—মাথাধরা, গা ব্যথা, পেশীর যন্ত্রণা ও মচকানিতে দ্রুত আরাম এনে দেয়।

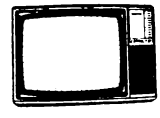

১০টি ১ম পুরস্কার
রঙিন টিভি

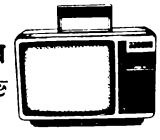

১০০টি ২য় পুরস্কার
১৪" সাদা-কালো টিভি

২০০টি ৩য় পুরস্কার
ইলেকট্রনিক ঘড়ি

নিয়মাবলী

১। ভারতের যে-কোনও নাগরিক এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। কিন্তু অমৃতাঞ্জন লিমিটেড এবং তার বিজ্ঞাপন এজেন্সির কর্মীগণ ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন না।

২। আপনি যতখুশি প্রবেশপত্র পাঠাতে পারেন। তবে প্রতিটি প্রবেশপত্রের সঙ্গে অমৃতাঞ্জনের একটি ১২ গ্রাম শিশির খালি কার্টন অবশ্যই পাঠাতে হবে।

৩। প্রবেশপত্র পেন্সিলে লিখে পূরণ করলে, ঘষে তোলার দাগ থাকলে, ছেঁড়া হলে, অস্পষ্ট হলে অথবা ডাকটিকিট বিহীন/কম পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত হলে তা বিবেচিত হবে না।

৪। প্রবেশপত্রের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ছেঁড়া কার্টন পাঠালে সেই প্রবেশপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা না দিয়ে প্রবেশপত্র পাঠালে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

৬। প্রবেশপত্র পাঠাবার সময়ে পথে খোয়া গেলে বা দেরিতে পৌঁছতে দেরি হলে তার দায়িত্ব অমৃতাঞ্জন নেবে না।

৭। প্রবেশপত্র ইংরেজি অথবা অন্য যে-কোনও ভারতীয় ভাষায় পূরণ করা যাবে।

৮। প্রবেশপত্র বিচার করবেন একটি বিচারকমণ্ডলী এবং তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে।

৯। প্রতিযোগিতা নিয়ে কোনরকম পত্রালাপ গ্রাহ্য হবে না।

১০। যে সব প্রবেশপত্র ও স্লোগান জমা পড়বে সেগুলি অমৃতাঞ্জন লিমিটেডের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

১১। পুরস্কার প্রদান করা হবে এই সংক্রান্ত আইন সাপেক্ষ।

১২। পূরণ করা প্রবেশপত্র ও অমৃতাঞ্জনের ১২ গ্রাম শিশির একটি খালি কার্টন খামে পুরে ও খামের উপরে "অমৃতাঞ্জন প্রতিযোগিতা" কথাটি লিখে অমৃতাঞ্জন লিমিটেড, ৪২-৪৫ লজ চার্চ রোড, মাইলাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪ ঠিকানায় পাঠাতে হবে ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৫ তারিখে অথবা তার আগে।

১৩। বিজয়ীদের ডাকযোগে জানানো হবে। ১ম পুরস্কার বিজয়ীদের নাম বড় বড় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

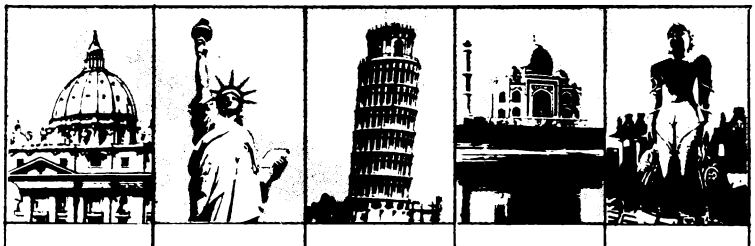

১। স্ট্যাচু অব লিবার্টি
২। তাজমহল
৩। গোমন্তেশ্বরের প্রতিমূর্তি
৪। সেন্ট পিটারস্ স্কোয়ার
৫। পিসার হেলে-পড়া স্তম্ভ

আমি অমৃতাঞ্জন পেইন বাম ব্যবহার করি, কারণ_____

_____

_____

_____

নাম _____

ঠিকানা _____

_____

_____

বিক্রেতার নাম_____

_____

ঠিকানা_____

_____

৯০ বছর ধরে আস্থাভাজন

অমৃতাঞ্জন

দ্রুত উপশম পেতে এর উপর নির্ভর করুন
—কোনরকম উপসর্গের ভয় নেই।

OBM 9257 BEN

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে। রাত্তিরে দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুন জ্বলে। তার অর্থ জানে বুধুয়া-বুড়ো। সায়ন একটা সওয়ারহীন ঘোড়ায় উঠেছিল। ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে নানা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। ঘোড়া ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতে সায়ন ছিটকে পড়ে যায়। সেখানে যিনি বিছের কামড় থেকে তাকে বাঁচান, তাঁর পোষা-হনুমানের নাম ইন্দ্র। ঘোড়াটা সাপের কামড়ে মারা গেছে। ভদ্রলোক ছিলেন নেতাজির অনুগামী। ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। পালিয়ে চল্লিশ বছর আত্মগোপন করে আছেন। ভারতবর্ষ যে ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়েছে, তা তিনি জানেন না। তারপর···

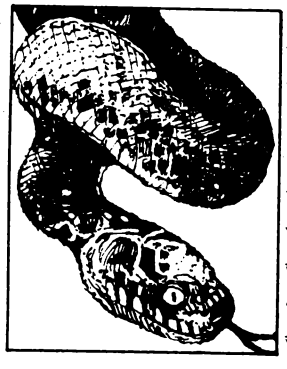

কাল রাত্রে কখন ঘুম এসেছিল সায়ন নিজেই জানে না। এই জঙ্গলে পাহাড়ের ওপরে ঘড়ি থাকার কথাও নয়। ঘড়ি দেখে এখানকার জীবন চলেও না। তবে মনে আছে সুধাময় সেনের মুখে গল্প শুনতে শুনতে আকাশের তারাগুলো যেন রঙ পালটে ফেলেছিল। সন্ধেবেলায় আকাশটা থাকে স্নিগ্ধ নীল শাড়ির মতো আর তারারা তার গায়ে নীল আলো ফেলে সেঁটে থাকে। কিন্তু রাত গড়িয়ে গেলে আকাশটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়, আর তারাগুলোকে দেখলে মনে হয় এই বুঝি খসে পড়ল। হলদেটে ভাব মাখামাখি হয় তাদের গায়ে। সায়নের মনে আছে, তার ঘুমোবার আগে আকাশটা যেন ওই রকম হয়ে গিয়েছিল।

সুধাময় সেন গল্প বলতে জানেন। সুভাষচন্দ্র বসু কীভাবে সাবমেরিনে চেপে সাত-সমুদ্র পেরিয়ে চলে এলেন পূর্বদেশে, এসে সংগঠিত করলেন ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তিবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ, সেই গল্প শুনতে-শুনতে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল সায়ন। এমন অনেক কাহিনী সে শুনল, যা এর আগে কেউ তাকে বলেনি বা কোনও বইতে পড়েনি। আর এই সব শুনতে-শুনতে রাতটা জঙ্গলের নিজস্ব শব্দ নিয়ে রহস্যময় হয়ে উঠল এবং ঘুম অক্টোপাসের মতো তাকে ঘিরে ফেলল কোন অসাবধানতায়, তা সে নিজেই জানে না।

এখানে সকাল হয় রমরমিয়ে। গাছে-গাছে পাখিরা তো বটেই, কচি কলাপাতার মতো ভোরের রোদও যেন কলকলিয়ে ওঠে। সেই সময় মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোনও দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, সর্বত্র একটা সুখের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সায়নের মাথায় কোনও ভাবনা কাজ করছিল না! একটু আগে ঘুম ভাঙার পর থেকেই সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল আকাশ এবং পৃথিবীর দিকে। তাদের চা-বাগানের বাংলোয় সকাল আসে পায়ে-পায়ে, কিন্তু এমন রাজার মতন নয়।

এই সময় সুধাময় সেন তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, "এখানকার সকালটা খুব সুন্দর, তাই না?"

সায়ন নীরবে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

সুধাময় বললেন, "এখানকার সবকিছুই সুন্দর। কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।" কথাটা বলেই সায়নের মনে পড়ল এখন তার ব্রাশ করার কথা। কিন্তু পেস্ট কিংবা টুথব্রাশ পাবে কোথায় সে? আর তখনই বাড়ির কথা মনে পড়ল। বুকের মধ্যে ঘুমন্ত কান্নাটা জেগে উঠল। সে স্পষ্ট গলায় বলল, "আমি বাড়ি যাব।"

সুধাময় বললেন, "আমি তোমার বাড়ির পথ চিনি না। যে চিনত সে চলে গিয়েছে। তোমাকে যেতে হলে একাই যেতে হবে। তুমি কি আজই যেতে চাও!"

সায়ন কথা বলল না। তার পক্ষে কি একা ফেরা সম্ভব? নদীটা পার হতে হবে। সেখানে খুব বড় কোনও প্রাণী আছে যেটা ঘোড়াটার গন্ধ পেয়ে তেড়ে এসেছিল। তারপর সেই জঙ্গলে হাতি, সাপ এবং হায়েনা। এ ছাড়া আর কি আছে তা জানা নেই। সবচেয়ে মুশকিল হল, সে পথটাই চেনে না। সুধাময় সেন বললেন, "তার চেয়ে আমি বলি কী, তুমি এখানে কিছুদিন থাকো। জায়গাটার সঙ্গে মানিয়ে নাও। জঙ্গলটার চরিত্র বোঝো। তারপর—" এই অবধি বলে সুধাময় যোগ করলেন, "তুমি আমাকে একটা সুখবর দিয়েছ। ভারতবর্ষ স্বাধীন। ইংরেজরা নেই। কিন্তু আমি আর সেখানে গিয়ে কী করব? এতদিন এই নির্জনে থেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর বোধহয় সেখানে গিয়ে আমি মানাতে পারব না।" ওঁর বুক নিংড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সায়ন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?"

"উঁ।" অন্যমনস্ক ছিলেন সুধাময়। তারপর মাথা নেড়ে না বললেন।

এই সময় ইন্দ্র এসে তাঁর পাশে বসতেই তিনি হাত রাখলেন ওর মাথায়, "এই এরাই আমার আত্মীয়। ওহো, তোমার পা কেমন আছে আজ? হাঁটতে পারবে?"

নিজের পায়ের কথা খেয়ালেই ছিল না, সায়ন এবার সাহস করে উঠে দাঁড়াল, "একটু অস্বস্তি ছাড়া তেমন কোনও ব্যথা নেই। চাপ দিলেও লাগছে না।"

সুধাময় খুশি হলেন, "যাক, তা হলে ভাঙে-টাঙেনি। এখানে তেমন কিছু হলেই ভীষণ বিপদ।"

"আপনি এত বছর এখানে আছেন, কোনও অসুখ-বিসুখ করেনি?"

"করেছে। এমনও হয়েছে, জ্বরে পাঁচদিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থেকেছি। তবে আস্তে-আস্তে জেনেছি, প্রকৃতি এই জঙ্গলে অনেক রকমের ওষুধের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই পাহাড় এবং জঙ্গলটাকে ভালবাসলে এমন সব মজাদার ব্যাপার জানতে পারবে যে, আর কখনও তোমার মন খারাপ লাগবে না। আমার তো অনেক বয়স হল, কিন্তু খুব বুড়ো দেখাচ্ছে

কি ? অ্যাঁ ? এখনও কী খাটাখাটনি করতে পারি !" নিজের শরীরটার দিকে তাকালেন সুধাময়।

দাঁত না মেজে বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। সায়ন সেই কথাটা বলল।

সুধাময় চোখ বড় করলেন, "ও, এই কথা !" তারপর উঠে গুহার ভেতরে ঢুকে একটা সরু গাছের ডাল নিয়ে এলেন, "এইটে চোখে পড়েনি তোমার ?"

সায়নের মনে পড়ল না, সে ডালটাকে দেখেছে কি না। মাথা নাড়তেই সুধাময় বললেন, "এইটে ঠিক নয়। জঙ্গলে বাস করতে গেলে তোমাকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে সবসময়। এটা হচ্ছে নিমগাছের ডাল। ভেঙে নিয়ে ব্রাশ করো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাঁতন।"

নিম-দাঁতন মোটেই অচেনা নয় সায়নের। বকুলকে সে রোজই ওটা দিয়ে দাঁত মাজতে দেখেছে। মাঝে-মাঝে তারও ইচ্ছে হত, কিন্তু মায়ের ভয়ে সেটা সম্ভব ছিল না। এখন ব্রাশের সাইজে গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে মুখে পুরল সায়ন। সুধাময় বললেন, "প্রথমে ডগাটা চিবিয়ে ছিবড়ে করে নাও, আর রসটা বের হলে ফেলে দিও। খুব তেতো।"

সুধাময় সেন গুহার ভেতরে চলে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রও অদৃশ্য হল। দাঁত মাজতে-মাজতে পায়চারি করছিল সায়ন পাথরের ওপরে। না, আর পায়ে লাগছে না তার। এবং তখনই মনে হল গতরাত্রে উলটো দিকের রাস্তাটায় কী হয়েছিল ? কারা এসেছিল ? সুধাময় তাকে সরে আসতে বাধ্য করেছেন, কিন্তু মনে হল কিছু একটা রহস্য আছে যা উনি তার কাছে চেপে যাচ্ছেন। মানুষটি এমনিতে খুব ভাল। একটা লোক সঙ্গীবিহীন হয়ে এত বছর জঙ্গলে আছেন, কিন্তু তেমন বুনো হয়ে যাননি। কারণ ওঁর হাতের নখগুলো মোটেই বড় নয়। জামা-প্যান্ট কি এতগুলো বছরে ঠিক রাখা সম্ভব ? চুল অবশ্য বেশ বড়, কিন্তু সেটা তো এখন পিঠ ছাড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য সায়ন জানে না ছেলেদের চুল বাড়তে দিলে কতটা বড় হয় ! কিন্তু তার মনে হচ্ছিল কোথাও যেন একটা গোলমাল আছে। সুধাময় সেন যদি এই জঙ্গলে বাস করেন এত বছর, তা হলে তিনি এখনও সভ্য আছেন কী করে ! কিন্তু ওঁকে এই প্রশ্নটা করা যাবে না। তার কথা বিশ্বাস করছে না জানলে যদি রেগে যান ?

হঠাৎ সায়নের খেয়াল হল তার চারপাশে হরেক রকম পাখি। বেশিরভাগ চড়াই। তবে টিয়া এবং বদরিও আছে। পাখিরা তাকে ঘিরে পাথরের ওপরে বসে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এবং ওরা এত কাছে যে হাত বাড়ালেই হয়তো ধরা যায়। পাখিগুলো মোটেই ভয় করছে না তাকে।

এই সময় শব্দ করে উঠল ইন্দ্র। আর তাকে দেখামাত্র পাখিদের যেন উৎসাহ বেড়ে গেল। সায়ন অবাক হল। ইন্দ্রের হাতে কাঠের পাত্র। তা থেকে মুঠো করে দানাজাতীয় কিছু ছড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, আর পাখিরা তাই হুটোপুটি করে খাচ্ছে। মজা লাগল খুব। ইন্দ্রের ভঙ্গি ঠিক মানুষের মতো। যেন ধামায় করে খাবার এনে খাওয়াচ্ছে পোষা জীবদের। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল সুধাময় গুহার দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ব্যাপারটা দেখছেন। চোখাচোখি হতে বললেন, "এগুলো সব পোষা পাখি। রোজ সকালে খাবার না পেলে মাথা খারাপ করে দেবে।"

"পোষা পাখি মানে ?"

হেসে ফেলল সুধাময়, "যে ডাকলে আসে, খিদে পেলে খেতে চায়, খাবার দিলে খুশি হয়, সে তো পোষাই। প্রকৃতিতে ছাড়া থাকে এই মাত্র। তোমার দাঁতন হয়ে গেছে ? এখানে জল তুলেছি এইমাত্র। মুখ ধুয়ে নিতে পারো। এখন তুমি সুস্থ। নিজের কাজ নিজেই করবে। প্রথম দিন বলে আমি জলটা তুলে দিলাম। তুমি দেখবে এসো, কী কায়দায় আমি জল তুলি এখানে।" ইশারা করে ভেতরে চলে যেতেই সুধাময়কে অনুসরণ করল সায়ন।

গুহার শেষে যে ছোট্ট ফোকরটি রয়েছে, তার মুখেই বসানো রয়েছে একটা কাঠের গোল লাঠি। লাঠির গায়ে অদ্ভুত ধরনের দড়ি বাঁধা। দড়ির প্রান্তে কাঠের পাতলা পাত্র। সুধাময় পাত্রটিকে ফোকরের বাইরে ফেলে লাঠিটাকে ঘোরাতে-ঘোরাতে বললেন, "চেয়ে দ্যাখো, দড়ি আলগা হয়ে যাচ্ছে। আমার বালতিটা নীচে নেমে যাচ্ছে। ওখানে নদী থেকে বেরিয়ে আসা একটা বাঁকে পরিষ্কার জল আছে। বালতিটা সোজা সেই জলে গিয়ে পড়বে। বালতির নীচে একটা পাথর বাঁধা আছে। জলে পড়লেই ওটা ডুবে যাবে। তারপর আবার উলটো দিকে ঘুরিয়ে জল-ভর্তি বালতিটাকে টেনে তুলতে হবে ওপরে। মাঝে-মাঝেই গোলমাল করে, কিন্তু বেশ কাজ চলে যায়। এখানে তো কপিকল পাওয়া যাবে না, তাই এই বন্দোবস্ত করে নিয়েছি।"

ততক্ষণে জল নিয়ে কাঠের বালতিটা ওপরে উঠে এসেছে। সায়ন হাত বাড়িয়ে সেটাকে ভেতরে নিয়ে এল। সুধাময় বললেন, "মুখ ধুয়ে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। ওই কোণে একটা গর্ত আছে, জল ঢাললে বেরিয়ে যায়। তুমি এখানেই সেরে নাও।"

সুধাময় চলে গেলে সায়ন মুখ ধুয়ে ফোকর দিয়ে দাঁতনটা বাইরে ছুঁড়ে দিল। আবছা অন্ধকারে তার নজরে পড়ল ডান দিকে গুহার মধ্যে আলমারির মতো খানিকটা জায়গা রয়েছে। সেখানটায় বেশ কিছু জিনিসপত্র রেখেছেন সুধাময়। অর্থাৎ ওইটেই তাঁর স্টোর-রুম। পরিষ্কার হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সুধাময় বললেন, "প্রাকৃতিক কাজের জন্যে এখানে আলাদা ব্যবস্থা নেই। বিশাল প্রকৃতি পড়ে আছে, জনমানবশূন্য, অতএব লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই।" কথাটা বলতে-বলতে একটু থমকে গেলেন তিনি, "প্রবলেম হবে তোমার জামাকাপড় নিয়ে, একেবারে একবস্ত্রে চলে এসেছ। কী করা যায় ?"

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল সায়ন, "আমি মোটেই এখানে আসতে চাইনি। আপনার ঘোড়াটাই জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এল !" কথাগুলো বলার সময় পায়ে অস্বস্তি হল। সায়ন দেখল, থেঁতলে যাওয়া অংশটায় কালচে ছাল পড়েছে। সেগুলো শুকিয়ে আসায় টান ধরেছে।

সুধাময় বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমার তো দেখছি মেজাজ খুব। সব সময় কথার সরল মানে ধরাই ভাল। যাক, যা বলছিলাম। তুমি বরং এক কাজ করো। তোমার তো আণ্ডারপ্যান্ট আছে ?"

সায়ন একটু লজ্জিত হল। সে ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

সুধাময় বললেন, "এখানে যখন থাকবে, তখন ওইটে পরে থেকো। না, না, লজ্জার কোনও কারণ নেই। আমি দেখছি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না। আমি তো তুমি আসার আগে দিনের পর দিন কষ্ট করে থেকেছি। না হলে এই জামা-প্যান্ট বাঁচত ?"

একটু পরেই খাবার এল। আর আজ সায়নের মনে হল, গরম দুধ কতকাল সে খায়নি। গোটা তিনেক ফল খেয়ে সকাল শুরু করতে হবে, এটা কে ভেবেছিল। সুধাময় বললেন, "মাংস আমরা দু'বেলা খাই। বাকি সময় ফল। অবশ্য রোজ মাংস খেতে ভাল লাগে না।"

"নদীতে মাছ নেই ?"

"আছে। কয়েক বছর আগে ধরেওছিলাম। কিন্তু আঁশ ছাড়ানো খুব ঝামেলার ব্যাপার। তা ছাড়া সেদ্ধ করলেই যেমন মাংসটা খাওয়া যায়, মাছ তো তেমন ভাবে যায় না। এবার আমরা বের হব। তুমি তা হলে—"

সুধাময়ের কথা শেষ না হতেই সায়ন বলল, "আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

ব্যাপারটা যেন পছন্দ হল না সুধাময়ের। বললেন, "তোমার অসুবিধে হবে। জঙ্গলের পথ তো পিচ-ঢালা নয়। খুব সাপখোপ চারপাশে।"

"তা হোক। আমার এখানে একা চুপ করে বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগবে না। তা ছাড়া আপনি তো একটু আগে বলেছেন যে, জঙ্গলের সঙ্গে মানিয়ে না নিলে আমি বাড়িতে ফিরতে পারব না ! আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

"তুমি নামতে পারবে ?"

"আমাকে দেখিয়ে দিন।"

সুধাময় সায়নকে ছোট চোখে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন। তারপর বললেন, "বেশ। এসো।"

গুহার ভেতর থেকে কয়েকটা অস্ত্র নিয়ে এসে একটা ভোজালির মতো জিনিস সায়নের হাতে দিলেন সুধাময়, "এটাকে সাবধানে কোমরে ঝুলিয়ে রেখো। তোমার এই পোশাক পরে যাওয়াটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। ওতে জঙ্গলে বেশ অসুবিধে হয়। তবে প্রথম দিন তুমি নিজেই বুঝে নাও। সব সময় কান খাড়া রাখবে আর জানবে জঙ্গলে কেউ তোমার বন্ধু নয়।"

উলটো দিকের পাহাড়ের ধারে চলে এল ওরা। এখান থেকে খাড়াই নেমে গেছে। নীচের জল দেখা যাচ্ছে। জায়গাটাকে চিনতে পারল সে। ওইখানেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আর ঘোড়াটা চিৎকার করছিল। সুধাময় বললেন, "আমি যা করছি, তুমি তাই করবে।"

তারপর একটা পাথরের আড়াল থেকে বিচিত্র ধরনের মোটা দড়ি বের করে নীচে ঝুলিয়ে দিলেন। সায়ন দেখল, সুধাময় সেই দড়ি ধরে খাঁজে-খাঁজে পা রেখে নীচে নেমে যাচ্ছেন। এত অভ্যস্ত উনি যে, মনে হচ্ছে দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নামছেন। সায়নের খুব ভয় করছিল। সে দড়ি বেয়ে কখনও নামা-ওঠা করেনি। যদি হাত পিছলে যায়, তা হলে আর দেখতে হবে না। নীচে নামার কি অন্য কোনও পথ নেই ! আছে। যেদিকে যাওয়ার ব্যাপারে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে, সেদিকে গেলে এইসব কসরত মোটেই করতে হত না।

নীচে নেমে সুধাময় ইঙ্গিত করলেন, হাত নেড়ে তাকে নেমে আসতে। সায়ন হাত বাড়িয়ে দড়িটাকে ধরল। বেশ

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—দাম খুবই কম।

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568/R/BEN

শক্ত। এইরকম দড়ি সে কখনও দ্যাখেনি। সুধাময় এটাকে কোত্থেকে পেয়েছেন কে জানে! সন্তর্পণে দড়ি ধরে খাঁজে পা রাখল সায়ন। তার হাতের তেলো এখন ঘামতে শুরু করেছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে পা রাখার খাঁজ করা আছে। বোধহয় সুধাময় করেছেন। নীচের দিকে তাকাতে ভয় করছিল তার। দড়িটা খুব দুলছে। আর সেই দোলার সময় খাঁজ থেকে যেই পা সরে যাচ্ছে, অমনি মনে হচ্ছে হাত পিছলে গেল বলে। নিশ্বাস বন্ধ করে নামছিল সায়ন। এই সময় তার পাশ দিয়ে সুড়ুত করে কিছু একটা নেমে যেতেই সে এমন চমকে উঠেছিল যে, দড়িতে হাতটা অনেকখানি পিছলে নেমে গেল। কোনওরকমে সেটাকে আঁকড়ে ধরে সে দুবার দোল খাওয়ার পর আবার পা রাখার খাঁজ খুঁজে পেল। বালিতে নামবার পর কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল সায়নের নিজেকে ফিরে পেতে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। সুধাময় ওর কাঁধে হাত রাখলেন, "খুব ভাল। কয়েকবার নামলে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ওঠার সময় হাতের ওপর বেশি জোর পড়বে। প্রতিটি খাঁজে পা রেখে শরীরটাকে টেনে টেনে তুলতে হবে। তবে তোমার শরীর তো হালকা, কোনও অসুবিধে হবে না।" সুধাময় দড়ির প্রান্তটা ধরে চেষ্টা করলেন এমনভাবে পাহাড়ের গায়ে চেপে রাখতে, যাতে চট করে বোঝা না যায় ওটা ওখানে আছে। তারপর বললেন, "এসো, ঠিক আমার পেছন-পেছন।"

চারধারে থমথমে জঙ্গল। শুধু নদীর মতো মনে হয়েছিল যে গভীর ঝরনা, সেটি চুপচাপ বয়ে যাচ্ছে এখানে। কিন্তু জলের শব্দ হচ্ছে নীচে। বোধহয় জলস্রোত ওখানে বাধা পাচ্ছে কিছুতে। সুধাময় নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিলেন। এখনও জঙ্গলে সকালের আমেজ। ওদের আগে-আগে ইন্দ্র যাচ্ছিল গম্ভীর মেজাজে। পায়ের তলায় অসমান জমি, বুনোঘাস। বাঁ দিকে পাহাড়, ডান দিকে নদী। এখনও রোদ নামেনি নদীতে। দু'পাশের গাছগাছালি চুঁইয়ে আলো ঢোকার সময় হয়নি এখনও।

নদীর গায়ে একটা খাঁড়িমতো জায়গায় এসে দাঁড়ালেন সুধাময়। সায়ন দেখল, অদ্ভুত ধরনের একটা নৌকো ঢোকানো রয়েছে সেখানে। সুধাময় বললেন, "কিছুদিন আগেও আমি এটায় করে যাতায়াত করতাম। কিন্তু এখন নদীতে এমন একটা প্রাণী এসেছে, যার কাছে এটা ডুবিয়ে দেওয়া কিছুই না।" চকিতে মনে পড়ল সায়নের, ঘোড়াটা কী ভয়ই না পেয়েছিল! সে জিজ্ঞেস করল, "কুমির?"

"না। কুমির এখানে আসবে কোত্থেকে? আমি ওর নাম জানি না। তবে জল ছেড়ে ওপরে কখনও ওঠে না, এই রক্ষে।" সুধাময় এবার নদীর ধার ছেড়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সায়নের মনে হল তার পায়ে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না। ওটা এখনও তেমন অসুবিধে করছে না। এদিকের জঙ্গলটা আরও গভীর। গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটা মুশকিল। সুধাময় সন্তর্পণে ডালপালা সরিয়ে এগিয়ে চলেছেন। দু'বার শরীর থেকে জোঁক ফেলল সায়ন। গাছের পাতা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে গায়ে উঠে আসে ওরা। চা-বাগানে সে জোঁক অনেক দেখেছে। এখন আর মোটেই ভয় লাগে না।

নদীর ধারে এই জায়গাটা বেশ সমতল। তবে গাছগাছালির ফাঁকে লতাগুল্ম ছেয়ে আছে। হঠাৎ ইন্দ্র ছুটে গেল এ-গাছ ধরে ও-গাছ ছুঁয়ে সামনের দিকে। সুধাময় হাসলেন, "আবার একটা পাওয়া গিয়েছে।" ততক্ষণে নজরে এসেছে সায়নের। লতাগুল্মের মধ্যে একজোড়া শিং দেখা যাচ্ছে। মানুষের গন্ধ পেয়েই বোধহয় শিং দুটো খুব নড়াচড়া করছে। কাছাকাছি পৌঁছে সায়ন দেখতে পেল মাঝারি সাইজের একটা হরিণ তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে লাফাতে গেল, কিন্তু গর্তটা তার পক্ষে এত উঁচু যে, ধাক্কা খেয়ে সেখানেই ফিরে পড়ল।

সুধাময় বললেন, "এই একটা হরিণ পেলে শীতকালে আমার দিনদশেক দিব্যি চলে যায়। গরমকালে মাংস বেশিদিন রাখা যায় না। তবে এই হরিণটাকে বোধহয় আমাদের ভোজে লাগানো যাবে না।"

সায়ন জিজ্ঞেস করল, "এটা এখানে পড়ল কী করে?"

"গতকাল আমি ফাঁদটা পেতে গিয়েছিলাম। ন' মাসে ছ' মাসে এক-আধবার এই ফাঁদটায় হরিণ কিংবা শুয়োর পড়ে। তোমার কপালেই এটাকে ধরা গেল!"

"এত সুন্দর হরিণটাকে মেরে ফেলবেন?"

সুধাময় কঠোর চোখে এইবার সায়নকে লক্ষ করলেন, "জঙ্গলের নিয়ম হল একজনের প্রাণের বিনিময়ে আর একজনকে বেঁচে থাকতে হবে। যার যত বুদ্ধি এবং শক্তি আছে, সে ততদিন জীবিত থাকবে। তোমরা যখন শহরে মাছ কিংবা মাংস খাও তখন তো তার একটা যুক্তি থাকে, তাই না? অবশ্য এই হরিণটাকে দান করতে হবে আমাকে।"

"কাকে দান করবেন?"

"দেখতেই পাবে।" সুধাময় একটা শক্ত ধরনের লতা ভোজালির কোপে কেটে নিলেন, সামনের গাছ থেকে। তারপর বললেন, "তুমি শিংটাকে ধরো। খুব ছটফট করবে, কিন্তু ওরা সাধারণত খুব ভিতু প্রকৃতির হয়। এই লতা হাতিও ছিঁড়তে পারবে না সহজে।"

সায়ন খপ করে হাত বাড়িয়ে নিচু হয়ে শিং দুটোকে ধরতেই প্রাণীটা একটা ঝটকা দিল। কোনওরকমে টাল সামলেও সেটাকে হাতছাড়া করল না সায়ন। যেহেতু গর্তে বেশি জায়গা নেই, তাই হরিণটা খুব জোর খাটাতেও পারছে না। এই সময় সুধাময় লতাটা শক্ত করে হরিণের শিংজোড়ায় এমন করে বেঁধে দিলেন যে কেটে না ফেললে খোলা সম্ভব নয়। লতার অন্য প্রান্ত একটা ডালে বাঁধলেন সুধাময়। তারপর দু'হাত দিয়ে হরিণটাকে টানতে লাগলেন ওপরে। মানুষটার শরীরে শক্তি আছে যতই বয়স হোক না কেন। সায়নও ওঁর সঙ্গে হাত লাগাল। প্রায় মিনিট আটেক ধস্তাধস্তি করার পর হরিণটাকে ওপরে তোলা গেল। ওপরে উঠেই হরিণটা তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে লতার টানে হোঁচট খেয়ে পড়ল। সুধাময় তখন হাঁফাচ্ছিলেন। একটু সময় নিয়ে তিনি বললেন, "হরিণটা কিছুক্ষণ লাফিয়ে কাহিল হোক, তারপর টেনে নিয়ে গ্রামে যাওয়া যাবে।" (ক্রমশ)

মণিমুকুট

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : হোলডার অ্যান্ড স্টিভেনস ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার আলেকজান্ডার হোলডারের বক্তব্য, বিখ্যাত একটি মানুষ তাঁর ব্যাঙ্কে এসে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ধার চান। বদলে তিনি গচ্ছিত রাখেন বেরিল করোনেট, যার দাম হবে প্রায় লক্ষ পাউন্ড। তারপর···

ঘটনার কথা বলতে-বলতে মিঃ হোলডার একটু থেমে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি ভাবছিলেন যে, কথাগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারছেন কি না। হোম্‌স বললে, "তারপর কী হল ?"

মিঃ হোলডার বললেন, "ও হ্যাঁ, বেরিল করোনেটের দামের কথা আমি ভাবছি কি না, ভদ্রলোক আমাকে এই কথা জিজ্ঞেস করতে আমি বললুম, 'না না, তা নয়। আমি শুধু ভাবছিলুম যে ···'

"'এটা এভাবে বাঁধা রাখা ঠিক হবে কি না ? এ-ব্যাপারে আপনি বিন্দুমাত্র ভাববেন না। চারদিনের মধ্যেই টাকা দিয়ে এটা ছাড়িয়ে নিতে পারব, এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে এ কাজ আমি করতুম না। এটা নিছক ব্যবসার খাতিরে বাঁধা রাখা। এখন বলুন এটা কি উপযুক্ত বিবেচনা করছেন ?'

"'যথেষ্ট।'

"'দেখুন মিঃ হোলডার, লোকের মুখে আপনার কথা শুনে আপনার ওপর আমি বিশ্বাস করেছি। আমি আশা করি আপনি আমার এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এ-ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনওরকম গালগল্প বা আলোচনা আপনি করবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, জিনিসটা খুব সাবধানে যত্ন করে রাখবেন। কেননা এটার কোনওরকম ক্ষতি হলে রাজ্যময় সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। এর একটু খুঁত হওয়া মানেই সমস্তটা বরবাদ হয়ে যাবে। এর সঙ্গে খাপ খাবে এমন বেরিল পৃথিবীতে আর একটিও নেই। যাই হোক, আমার এ-বিশ্বাস আছে যে আপনার হেফাজতে থাকার সময়ে এর কোনও ক্ষতি হবে না। সোমবার দিন সকালে আমি নিজে টাকা নিয়ে এসে এটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।'

"ভদ্রলোকের যাবার তাড়া ছিল দেখে আমি আর কোনও কথা বললুম না। আমাদের ক্যাশিয়ারকে ডেকে ওঁকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দিতে বলে দিলুম। ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমার টেবিলের ওপরে বসানো ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বিশেষ করে এর মধ্যে যে দামি জিনিস রয়েছে তার কথা ভেবে আমার মনে ভয় আর অস্বস্তি হতে শুরু করল। জিনিসটা যে কত দামি তা বোধহয় বলে বোঝানো যাবে না। বিশেষত এটা আমাদের একটা জাতীয় সম্পত্তি। এটার যদি কণামাত্র ক্ষতি হয় তো সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে। আর সে কথা কিছুতেই গোপন রাখা যাবে না। এরকম একটা জিনিস বন্ধক রেখে যে ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছি, সে-কথা ভেবে আমি হাত কামড়াতে লাগলুম। যাই হোক, এখন আর আক্ষেপ করে কোনও লাভ নেই। তাই ব্যাগটা আমার নিজের 'সেফে' চাবিবন্ধ করে আমি হাতের কাজ সারতে লাগলুম।

"সন্ধেবেলায় আমার মনে হল যে, এটা ব্যাঙ্কে রেখে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ব্যাঙ্কের আয়রন সেফ ভেঙে চুরি যে হয়নি এমন তো নয়। আমার ব্যাঙ্কের সেফই যে কেউ ভাঙবে না তা কি বলা যায় ? তা যদি হয় তাহলে আমার অবস্থাটা কী হবে ? আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললুম যে, এ কদিন এই জিনিসটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসব, নিয়ে যাব। তাহলে ওটা সব সময়েই আমার চোখে চোখে থাকবে। সব দিক ভেবেচিন্তে আমার মনে হল এই বুদ্ধিটাই ভাল। তখন আমি একটা গাড়ি ডাকতে বললুম। যতক্ষণ না জিনিসটা আমার দোতলার ঘরের সিন্দুকে পুরে চাবি দিতে পারলুম ততক্ষণ আমার শান্তি ছিল না।

"এখন আমার বাড়ির সম্বন্ধে আপনাকে দু-চার কথা না বললে আপনি হয়তো সব ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝবেন না। কোচোয়ান আর সহিস আমার বাড়িতে থাকে না, তাই তাদের বাদ দেওয়াই উচিত। বাড়ির কাজের জন্যে যে মেয়েরা আছে তাদের তিনজন বহুদিন আমার কাছে কাজ করছে। তারা অত্যন্ত সৎ আর বিশ্বাসী। তাদের কোনওভাবেই সন্দেহ করা যায় না। লুসি পার বলে একটি মেয়েকে মাস-কয়েক আগে কাজে বহাল করা হয়েছে। সে খুব ভাল লোকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছিল, আর তার কাজে বা ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছু দেখিনি। মেয়েটির বয়েস কম। তার বন্ধু-বান্ধবরা মাঝে-মাঝে আমার বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করে। তবে মেয়েটির আচার-আচরণ, স্বভাব খুবই চমৎকার।

"এ তো গেল আমার লোকজনের ফিরিস্তি। আমার নিজের সংসার খুবই ছোট। আমি বিপত্নীক। আমার এক ছেলে, আর্থার। আমার ছেলেটি তেমন মানুষ হয়নি। মিঃ হোমস, ছেলেটির জন্যে আমার যা কিছু দুঃখকষ্ট। আমি স্বীকার করছি যে, হয়তো আমার দোষেই ছেলেটি এ-রকম বিগড়ে গেছে। লোকে বলে আমি তাকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে গোবর করে ফেলেছি। হয়তো কথা ঠিকই। আমার স্ত্রী যখন মারা যান, তখন ওই ছেলেটি ছাড়া নিজের বলতে আমার কেউ ছিল না। আমি ছেলেটির সব আবদার মেনে নিয়েছি। আমি চাইতুম সে যেন সবসময়েই বেশ ফুর্তিতে থাকে। এতটা না করলেই বোধহয় তার আর আমার দু'জনের পক্ষেই ভাল হত। তবে একথা বলতে পারি যে, যা করেছি তা ভাল হবে মনে করেই করেছি।

"আমার মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে, আমার পরে সে যেন ব্যবসায় আমার জায়গায় বসে। কিন্তু ভাল ব্যবসা করতে গেলে যে-যে গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে তার একটাও নেই। সে বেহিসেবি, চঞ্চল স্বভাবের। সত্যি কথা বলতে কী, বেশি টাকা তার দায়িত্বে রাখতে আমি নিজেই রাজি নই। অল্প বয়সে সে একটা নামী অভিজাত ক্লাবের সদস্য হয়। তার অমায়িক

ফুর্তিবাজ স্বভাবের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি ক্লাবের কিছু পয়সাওলা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ফেঁদে বসে। ক্লাবেই সে তাস খেলতে শেখে। আর ঘোড়দৌড়ের পিছনে পয়সা ওড়াতে শুরু করে। সে প্রায়ই আমাকে বলে, তার হাতখরচার অঙ্কটা বাড়িয়ে দেবার জন্যে যাতে করে সে বাজারে তার যত ধার আছে মিটিয়ে ফেলতে পারে। দু-চারবার এই কু-সঙ্গ ছাড়বারও চেষ্টা সে করেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তার বন্ধু সার জর্জ বার্নওয়েলের টানে সে আবার ক্লাবে ফিরে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, বার্নওয়েল যে আর্থারকে এত বশ করে ফেলেছে এতে আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হইনি। সে দু-চারবার আমার বাড়িতে এসেছে। তার ব্যবহারে কথাবার্তায় আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। বার্নওয়েলের চেহারাটি যেমন সুন্দর, কথাবার্তাও তেমনি চমৎকার। হেন জায়গা নেই যেখানে সে যায়নি, হেন বিষয় নেই যার সম্বন্ধে সে জমিয়ে, রসিয়ে কথা বলতে না পারে। কিন্তু আড়ালে যখনই তার কথা ভাবি তখনই আমার মনে হয় লোকটা সুবিধের নয়। ওর সুন্দর চোখের চাউনি, মিষ্টি কথাবার্তার আড়ালে একটা ঘড়িয়াল লোক লুকিয়ে আছে। এটা আমার একার কথা নয়। মেরিরও তাই মত।

"ওহ্, মেরির কথা আপনাকে বলা হয়নি। ও আমার ভাইঝি। বছর পাঁচেক আগে ওকে সম্পূর্ণ অনাথ অবস্থায় রেখে আমার ভাই মারা যায়। আমি তখন ওকে আমার কাছে এনে রাখি। আমার মেয়ের মতো মানুষ করি। ভারী সুন্দর দেখতে। স্বভাবটি তেমনি লক্ষ্মী। ওই আমার বাড়ির গিন্নি। আর শুধু সংসারের কর্ত্রী নয়, ও আমার ডান হাত।

"আমার ঘর-সংসারের মোটামুটি একটা ছবি তো আপনাকে দিলুম। এবার আবার কাজের কথায় ফিরে আসি। সেদিন রাত্তিরে খাওয়ার পরে আমার বসবার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে আমি আর্থার আর মেরিকে ওইদিন আপিসে যা-যা ঘটেছে সব বললুম। অবশ্য আমার দেনদারের পরিচয় ওদের কাছে দিইনি। কফি নিয়ে এসেছিল লুসি পার। কফি রেখেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল কি না সে-কথা আমি হলফ করে বলতে পারব না। আমার কথা শুনে আর্থার আর মেরি তো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ওরা জিনিসটা দেখতে চাইছিল কিন্তু আমার মনে হল যে ওটাকে বেশি খোলাখুলি করা ঠিক হবে না।

"আর্থার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওটাকে রেখেছ কোথায় ?'

"'কেন, আমার সিন্দুকে।'

"ও বলল, 'হে ভগবান, আজ রাত্তিরে যেন আমাদের বাড়িতে চোর না আসে।'

"আমি বললুম, 'সিন্দুকে চাবি দেওয়া আছে।'

"আর্থার বলল, 'তোমার ওই সিন্দুক যে-কোনও চাবিতেই খুলে যায়। ছেলেবেলায় আমি ভাঁড়ারঘরের আলমারির চাবি দিয়ে কতবার তোমার ওই সিন্দুক খুলে দেখেছি ওর ভেতরে কী আছে।'

"আর্থারের স্বভাবের আর এক দোষ হচ্ছে এইরকম আবোলতাবোল বকা। আমি ওর কথায় কান দিলুম না। আর্থার আমার সঙ্গে আমার ঘর পর্যন্ত এল।

"'বাবা,' মেজের দিকে তাকিয়ে ও বললে, 'তুমি কি আমাকে শ-দুই পাউণ্ড দিতে পারো ?'

"'না,' আমি খুব কড়াভাবে বললুম, 'দিতে পারি না। আমি তোমাকে তোমার যা দরকার তার চাইতে অনেক বেশি টাকা দিই।'

"'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তবে এ-টাকাটা আমার চাই, নইলে আমি আর ক্লাবে মুখ দেখাতে পারব না,' আর্থার বললে।

"আমি চেঁচিয়ে উঠে বললুম, 'সেটা তো খুবই ভাল কথা।'

"'তা হতে পারে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এটা চাও না যে সেখান থেকে অপমানিত হয়ে আমি চলে আসি। অপমান হজম করতে পারব না আমি। যে করেই হোক এই টাকাটা আমাকে যোগাড় করতে হবে। তুমি যদি না দাও তো অন্য কীভাবে টাকা সংগ্রহ করা যায় সে কথা ভাবতে হবে।'

"আর্থারের কথায় আমার রাগ আরও বেড়ে গেল। এ মাসে এ নিয়ে সে তিন-তিনবার আমার কাছে টাকা চেয়েছে। আমি চিৎকার করে বললুম, 'আমার কাছ থেকে তুমি আর একটি পয়সাও পাবে না।' এই কথা শুনে সে আর কোনও কিছু না বলে মাথা দুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আর্থার চলে যাবার পর আমি সিন্দুক খুলে জিনিসটা ঠিকমতো আছে কি না দেখে নিয়ে সিন্দুক আবার চাবি বন্ধ করে দিলুম। তারপর সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখবার জন্যে আমি গোটা বাড়িটা একবার চক্কর দিতে গেলুম। এ-কাজটা রোজ মেরিই করে। তবে বুঝতেই পারছেন, কী জন্যে আজ আমি নিজেই তদারক করতে গেলুম। দোতলা থেকে নামবার সময় আমি সিঁড়ি থেকেই দেখতে পেলুম যে, মেরি হলের পাশের দিকের একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি যখন তার কাছে গেলুম তখন সে জানলাটা বন্ধ করছিল।

"'বাপি, তুমি কি আমাদের ওই লুসি বলে কাজের মেয়েটিকে আজ রাতে বাইরে বেড়াতে যেতে বলেছিলে ?' মেরির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল সে যেন খুব ভাবনায় পড়ে গেছে।

"'না তো।'

"'আমি ওকে এইমাত্র খিড়কিদরজা দিয়ে ঢুকতে দেখলুম। আমার মনে হয় ওই পাশের দরজায় ও কারুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ওকে বারণ করে দিতে হবে।'

"'কাল সকালেই তুমি ওকে ডেকে বারণ করে দেবে। আর যদি তুমি বকাঝকা করতে না চাও তো আমিই ওকে বকে দেব।... যাই হোক, সব ঠিকমতো বন্ধটন্ধ আছে তো ?'

"'হ্যাঁ, বাপি, সব বন্ধ আছে।'

"'তা হলে ঠিক আছে।'

"মেরিকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমি শুতে গেলুম আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

"মিঃ হোমস, আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলবার চেষ্টা করছি, যাতে করে এই মামলার কোনও সূত্র বাদ না যায়। তা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যাপারে আপনার মনে কোনও প্রশ্ন থাকে, তো আমাকে সে কথা বলবেন।"

"না না, আপনি সব কথাই বেশ সহজ করে গুছিয়ে বলছেন। খুঁটিনাটি তথ্য কিছুই বাদ যায়নি।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ধাঁধা

ছোট্‌কার সঙ্গে এতকাল মিশেও ছোট্‌কার কথার মারপ্যাঁচ আর ধরনধারণ রপ্ত হল না আমার। সহজ কথাকেও এমন পেঁচিয়ে বলতে পারে ছোট্‌কা, যে চট করে মাথায় খেলে না, ঠিক কী বলতে চাইছে। ফলে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে হয়।

সেদিনের কথাই ধরো না। ছোট্‌কাই বলে রেখেছিল, রাত্রে খাওয়ার পর ধাঁধা দেবে। তা আমি তো গেছি। ছোট্‌কার ঘরে অল্প আলো জ্বলছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে ছোট্‌কা বই পড়ছিল একটা। আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললাম, "কটা বাজে ছোট্‌কা?"

ছোট্‌কা হাতঘড়িটা টেবিল থেকে তুলে দেখল। তারপর রেখে দিয়ে বলল, "ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন, এইট, নাইন, টেন।"

আমি তো অবাক। এটা কোনও উত্তর হল?

আর আমার ওই ফ্যালফ্যাল চাহনি দেখে ছোট্‌কার সে কী হাসি! হাসি থামিয়ে ছোট্‌কা বলল, "কী, মাথায় ঢুকল না তো?" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "উত্তর কিন্তু ভুল দিইনি আমি। যা বলেছি, ভাল করে ভেবে দ্যাখ। ওর মধ্যেই সঠিক সময় বলা আছে।"

ছোট্‌কার বলা উত্তরটা তখনও আমার মাথায় ঘুরছে। কী বলল ছোট্‌কা? ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন, এইট, নাইন, টেন—এই তো? এ থেকে কি কিছু বোঝা যায়?

ছোট্‌কা বলল, "বেশ তো, সময় নিয়েই উত্তর দিয়ো সতুবাবু। ধাঁধা নিতে এসেছ তো? তা বেশ, এটাই ধাঁধা হোক নাহয়। এটাই প্রথম ধাঁধা হিসেবে ধরে নাও বরং।"

তোমরা কী বলো? এটাই হবে প্রথম ধাঁধা? বেশ, তাই হোক। এই উত্তরের মধ্য থেকে খুঁজে বার করো, ক'টা বাজার কথা বলতে চেয়েছিল ছোট্‌কা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ চারটে আঙুল আছে, একটা বুড়ো আঙুলও আছে—এমন কোন্ জিনিস, যা কিনা হাত নয়?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নীচের জট পাকানো অক্ষরগুলোকে বাছাই করে একজন বিখ্যাত লোকের নাম বার করতে হবে—

দানসমরকদন্ধীমোচাঁগাহ

গতবারের ধাঁধার উত্তর ॥ (১) (ক) Unique (খ) Liquid (গ) Ettiquette (ঘ) Piquant (ঙ) Oblique. (২) Intelligence Quotient. (৩) নাকানিচোবানি।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

■	১	২	৩		■	৪
৫	■	৬		■	৭	
৮	৯	■	১০	১১		
■	১২	১৩	■	১৪		■
১৫			১৬	■	১৭	১৮
১৯		■	২০	২১	■	
	■	২২				■

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ডেনমার্কের লোক। (৬) অল্প। (৭) বন্ধু। (৮) মার্জনা। (১০) মঙ্গলকাব্যের চরিত্র। (১২) মকুব। (১৪) মা যাঁর ননদ। (১৫) সাফল্য। (১৭) পূর্ণচন্দ্র। (১৯) মঙ্গল। (২০) মুকুট। (২২) অস্ত্রবিশেষ।

উপর-নীচ :(২) নজরের আগে বসে। (৩) মকদ্দমা। (৪) প্রশংসা। (৫) ভালুক। (৭) কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। (৯) দ্বারা। (১১) দুর্গার আর-এক নাম। (১৩) পাপড়ি। (১৫) ঘোড়ার দেখ্‌ভাল্ করে। (১৬) দস্যুদলবিশেষ। (১৮) বধির। (২১) কোন্ ফুল ওলটালে মেঘ ডাকে?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ব	ড়	বা	■	মা	কা	লু
ক	■	র্তা	■	দ	■	কো
ল	■	কু	শ	ল	■	চু
মা	কু	■	বে	■	প	রি
■	রু	■	ব	■	দ্মা	■
■	ব	ক	রা	ক্ষ	স	■
চি	ক	■	ত	■	ন	থ

রঞ্জন

মজার খেলা

মজার খেলা বলব, না মজার ম্যাজিক ? এবারে যে-মজার খেলাটা শিখব আমরা, তা আসলে ম্যাজিকের মতো করেই দেখাতে হবে, শুধু সবশেষে বোঝা যাবে, ব্যাপারটা মোটেই ম্যাজিক নয়, স্রেফ মজা।

খেলাটা বলি আগে। দর্শক বন্ধুদের এক টুকরো কাগজ দিয়ে বলো, "এই কাগজে তুমি আমাকে না দেখিয়ে যা খুশি লিখবে। কোনও খেলোয়াড়ের নাম, সাহিত্যিকের নাম, জায়গার নাম, যা খুশি। আমিও আর-একটা কাগজে হুবহু তাই লিখব।"

বন্ধু পাশের ঘরে গিয়ে লিখুক। তুমিও তোমার কাগজটা নিয়ে কাউকে না দেখিয়ে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখো এই দুটো শব্দ—'হুবহু তাই'। এবার কাগজটাকে দু ভাঁজ দিয়ে চৌকো করে ফেলো।

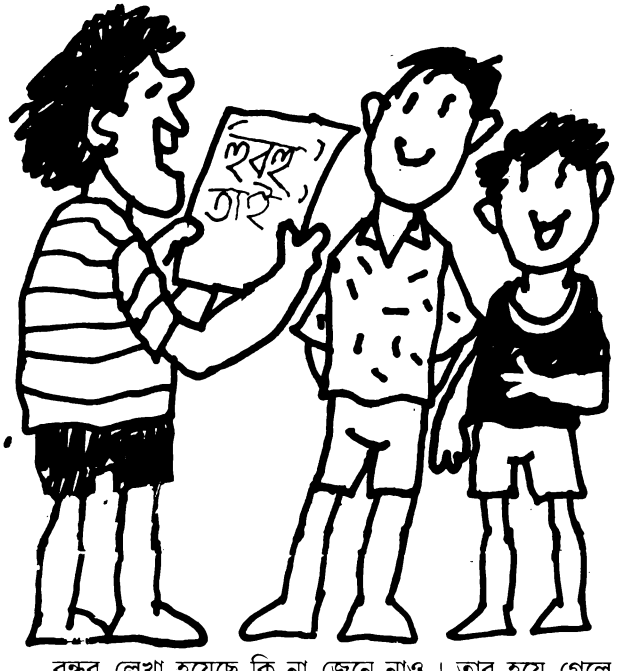

বন্ধুর লেখা হয়েছে কি না জেনে নাও। তার হয়ে গেলে সেই কাগজটা অন্য একজনের হাতে দিয়ে তাকে লেখাটা পড়ে শোনাতে বলো। সবাই শুনুক, বন্ধু কী লিখেছে।

এবার তোমার কাগজটা সেই তৃতীয় বন্ধুকেই দাও। তাকে অনুরোধ করো, তোমার কাগজে যা লেখা রয়েছে সে যেন পড়ে শোনায়।

বন্ধু পড়ে শোনাবে—'হুবহু তাই'।

ফলে, এক মুহূর্তের জন্য সবাই ভাববে, তুমি বোধহয় দারুণ একটা ম্যাজিক দেখালে। হাততালি পড়বে তোমার জন্য। কিন্তু, বেশিক্ষণ চলবে না। তৃতীয় দর্শকবন্ধুই আসল রহস্যটা ফাঁস করে দেবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু মজা যা হবার আগেই হয়ে গেছে। ধরা পড়লে মজা বাড়বে ছাড়া কমবে না। কেননা, তুমি তো মিথ্যে বলনি। 'হুবহু তাই' যে লিখবে, সেটা তো বলেই নিয়েছ আগে।

মজারু

হাসিখুশি

"আপনি বলছেন, দুজন লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করছিল। তা আপনি ওদের থামাবার চেষ্টা করলেন না কেন ?"

"আর কোনও লাঠি ছিল না যে ওখানে !"

"আপনার হাতটা অপারেশন করা খুবই জরুরি। আপনার কি অত টাকা আছে অপারেশন করাবার জন্য ?"

"আমার যদি টাকা না থাকে তাহলেও কি অপারেশনটা জরুরি মনে করবেন ডাক্তারবাবু ?"

"বলছেন আপনার প্রেসার আছে। তা হাই না লো ?"

"চারতলায় আমার অফিস। হাই প্রেসারই হবে বোধহয়।"

"কর্ম আছে অথচ কর্তা নেই, এমন একটি বাক্য বলতে পারো বুবাই ?"

"চাকরি চলে যাওয়ার ভুল খবর পেয়ে অজয়বাবু ঘরছাড়া হলেন।"

"জাল টাকা আর পাগল খরগোশের মধ্যে মিল কোথায় বলতে পারেন ?"

"একটা হল ব্যাড মানি, অন্যটি ম্যাড বানি।"

"তোমার ছেলে তো এবারেও ফেল করেছে। পাশ করলে ও কী হবে ভেবেছ ?"

"এতে আর ভাববার কী আছে ? তখন ও বুড়ো হবে।"

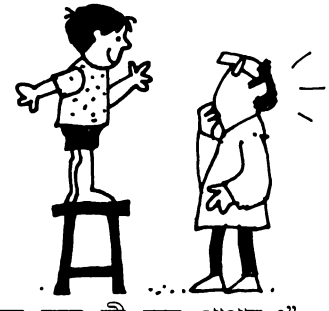

"তুমি বড় হলে কী হবে পাপান ?"

"লম্বা হব বাবা।"

ছবি : দেবাশিস দেব

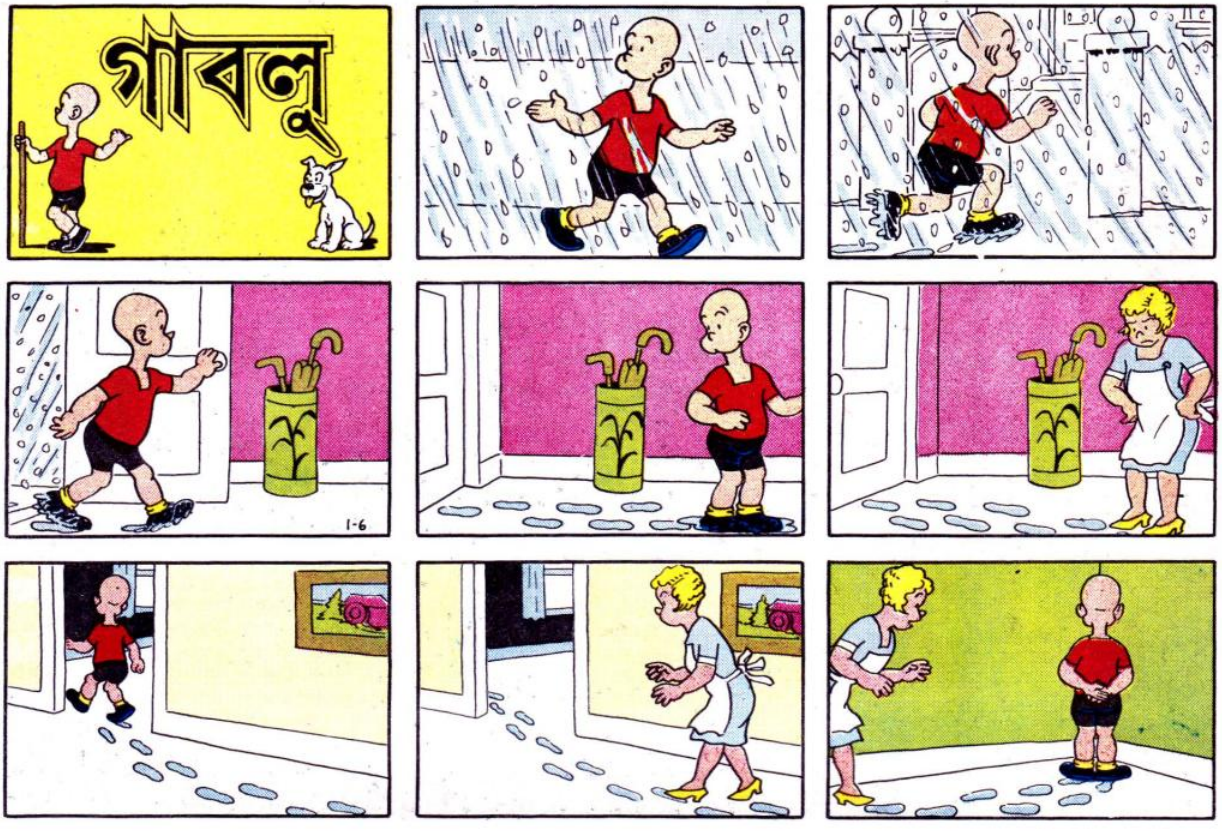
গাবলু
1-6

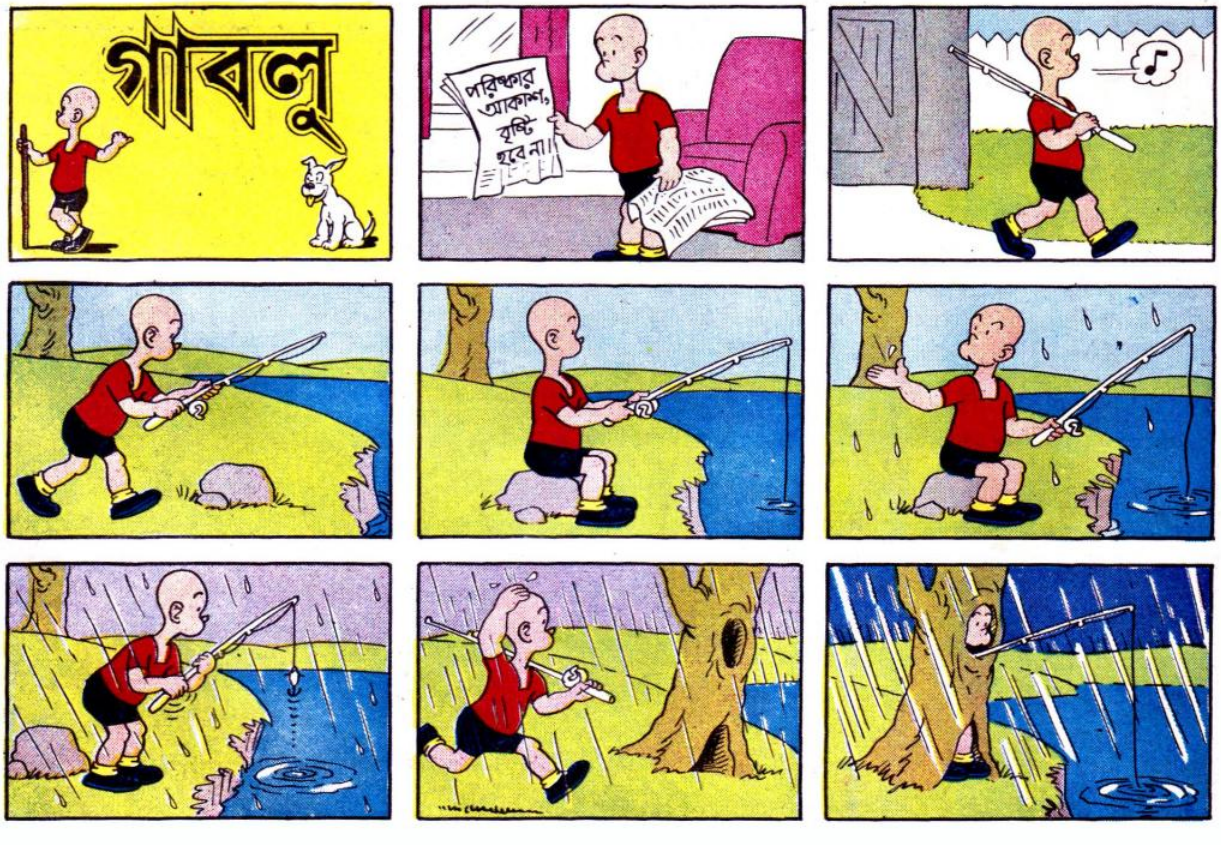
গাবলু
পরিষ্কার আকাশ, বৃষ্টি হবে না।

বেঙ্গসরকর

(ব্যাটিংয়ে ভারতের প্রধান ভরসা ?)

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

প্রথম টেস্টে ভারত বেঁচে গেল

অশোক রায়

আত্মতুষ্টির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে একটা দল যে কতটা বিপদে পড়তে পারে, সেটা নতুন করে দেখা গেল ভারত-শ্রীলঙ্কার প্রথম টেস্টে। টেস্ট ক্রিকেটে নতুন-আসা শ্রীলঙ্কা ভারতের নামী, অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের একেবারে শুরু থেকেই কোণঠাসা করে রেখে বুঝিয়ে দিলেন, একদিনের ক্রিকেটের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানকে তাঁরা পাত্তাই দিচ্ছেন না।

টস জিতেও ভারী আবহাওয়ায় ভারত ব্যাটিং নেয়। এবং হালকা মেজাজে খেলা শুরু করে। যে দল মাত্র ১২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে, স্বাভাবিকভাবেই সেই দলে লিলি, বথাম, মার্শালদের মতো পেসবোলার থাকবে আশা করা যায় না। কিন্তু শ্রীলঙ্কা দলের দু'জন সাধারণ মানের মিডিয়াম পেসার অশান্ত ডি'মেল এবং রুমেশ রত্নায়েকেকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অসাধারণ করে তুললেন। বহির্মুখী বলে ক্রমাগত খোঁচা লাগিয়ে একের পর এক ভারতীয় ব্যাটসম্যান উইকেটকিপার অমল সিলভাকে ক্যাচ প্র্যাকটিস দিয়ে ফিরে এলেন প্যাভিলিয়নে।

ভারতীয় দলে প্রথম টেস্ট খেলতে-নামা ওপেনার লালচাঁদ রাজপুত (৩২), শ্রীকান্ত (২), আজহার (৩), বেঙ্গসরকর (৬), এবং শাস্ত্রী (৯) সাজঘরে ফিরে যান বোর্ডে মাত্র ৬৫ রান রেখে। গাওস্করের সঙ্গে জুড়ি বাঁধেন কপিলদেব। কপিল ঠিক করেই নেমেছিলেন বোলিংকে আক্রমণ করবেন। করলেনও। হিংস্র পুল, ড্রাইভ, কাটে কপিল প্রায় ঝড়ের গতিতে ভারতকে ১০০ রানে পৌঁছে দিলেন। এবং মুহূর্তের অসাবধানতায় আউট হয়ে গেলেন ডি'মেলের আউট সুইংয়ে। ভারত প্রথম দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে ধুঁকতে-ধুঁকতে প্যাভিলিয়নে ফিরল। এবং তাকিয়ে রইল উইকেটে ৪৩ অপরাজিত গাওস্করের দিকে।

পরের দিন ভারত ২১৮ রানে শেষ হয়ে গেল। গাওস্করের ৫১ রান এবং ডি'মেলের ৬৪ রানে ৫ উইকেট দু'পক্ষের সেরা সংগ্রহ হয়ে রইল। শ্রীলঙ্কার উইকেটরক্ষক অমল সিলভা ছ'টি ক্যাচ ধরে বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা খোঁচা মারার ব্যাপারে কতখানি সিদ্ধহস্ত।

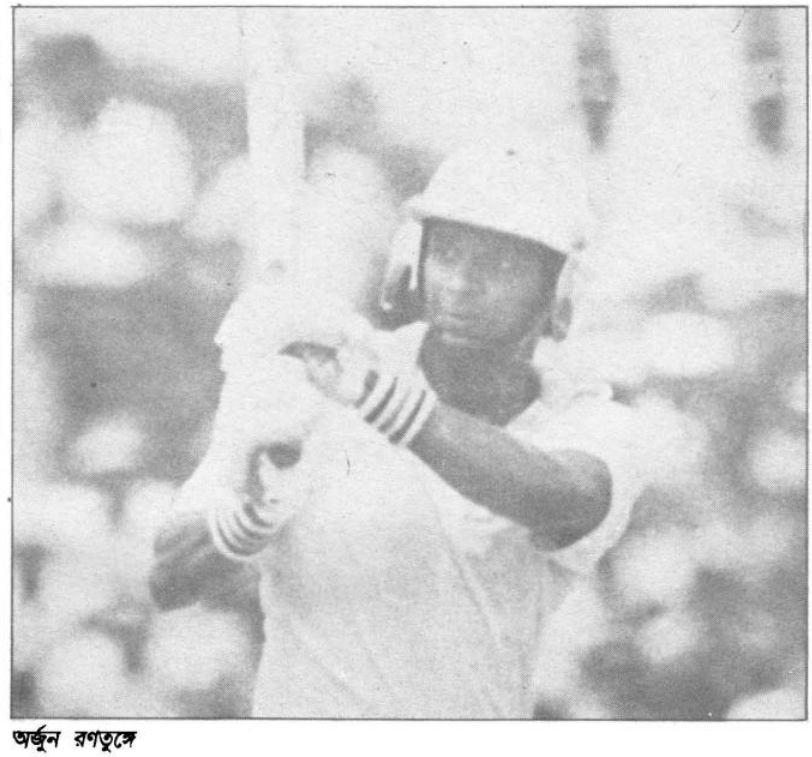

অর্জুন রণতুঙ্গে

এর পর শ্রীলঙ্কা শুরু করল ধীরেসুস্থে। ভারতের রান ছাড়িয়ে যাবার পরেও তারা দুর্বোধ্য কারণে দ্রুত রান তোলার ব্যাপারে মন দিল না। রঞ্জন মদুগালে (১০৩), অর্জুন রণতুঙ্গে (১১১) সেঞ্চুরি পেলেন ঠিকই, কিন্তু শ্রীলঙ্কার হাত থেকে চলে গেল মূল্যবান অনেকখানি সময়। চতুর্থ দিনে শ্রীলঙ্কা ইনিংস শেষ করল ৩৪৭ রানে। ১২৯ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামল নিশ্চিত পরাজয় রোখার চেষ্টায়। শ্রীকান্ত (৯), আজহারউদ্দিন (১৬), গাওস্কর (০) এবং রাজপুতের (৬১) উইকেট হারিয়ে চতুর্থ দিনের শেষে ভারত পৌঁছল ১৫৩-৪। বেঙ্গসরকর (৪২) ও শাস্ত্রী (১৭) ইনিংস পাহারা দিচ্ছিলেন।

পঞ্চম দিন শাস্ত্রী (৪০), কপিল (৬), সদানন্দ বিশ্বনাথ (০), চেতন শর্মা (৪), গোপাল শর্মা (২) ও মনিন্দর (৩) শুকনো পাতার মতো ঝরে গেলেন। দিলীপ বেঙ্গসরকর অপরাজিত রয়ে গেলেন অসাধারণ, সংগ্রামী ৯৮ রানের ইনিংস খেলে। বেঙ্গসরকর টেস্টে তাঁর দশম শতরানটি পেলেন না ঠিকই কিন্তু দলের স্বার্থরক্ষায় তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকা সেঞ্চুরির চেয়েও বেশি। ভারত ২৫১ রানে ইনিংস শেষ করায় ১১টি বাধ্যতামূলক ওভারে শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্যে দরকার ছিল ১২৩ রানের। প্রায় অসম্ভব কাজ। তবু কপিলের প্রথম চার বলে ১৫ রান নিয়ে শ্রীলঙ্কা শুরু করেছিল দুঃসাহসিকভাবেই। শেষপর্যন্ত জয় অসম্ভব জেনেই ৮ ওভারে ৪ উইকেটে ৬১ রান তুলে শ্রীলঙ্কা ড্র মেনে নেয়। 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন রুমেশ রত্নায়েকে।

কেউ কেউ বলছেন, ভারতের দ্বিতীয় দফায় ১১৬ মিনিট খেলা বৃষ্টিতে বন্ধ না হলে ভারতের পক্ষে এই ম্যাচ বাঁচানো সম্ভব হত না। কথাটা হয়তো খুব মিথ্যে নয়।

'অ্যাশেজ' ইংল্যাণ্ডের

সম্রাট রায়

সিরিজে ২-১ ম্যাচে এগিয়ে থাকার সুযোগ হাতে নিয়ে ইংল্যাণ্ড ষষ্ঠ টেস্টের শুরু থেকেই চেয়েছিল কোনওক্রমে একটা ড্র করতে। খেলাটা অমীমাংসিত রাখতে পারলেই 'অ্যাশেজ' পুনরুদ্ধার করা যাবে, এটা যেমন ইংল্যাণ্ড জানত, তেমনি অস্ট্রেলিয়াও বুঝে নিয়েছিল শেষ টেস্টে মরণ কামড় দিতে না পারলে অ্যাশেজ রক্ষার আর কোনও আশা নেই।

কিন্তু বিধি বাম। টসে জেতাটা যখন সবচেয়ে দরকার, ঠিক তখনই হেরে বসলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার। উষ্ণ এবং চমৎকার আবহাওয়ায় সহজ পিচে ইংল্যাণ্ড ধীরেসুস্থে ইনিংস শুরু করল। উইকেটে বাউন্স থাকায় দুই অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার জিওফ লসন আর ক্রেগ ম্যাক্‌ডারমট বেশ কিছু শর্টপিচড বল করে ব্যাটসম্যানদের শঙ্কিত করে রাখলেন প্রথম দিকে। পর পর কয়েকটা বল ঠোকার পরে হঠাৎই একটা ইয়র্কারে ওপেনার টিম রবিনসনকে বোল্ড করে দিলেন ম্যাক্‌ডারমট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের সাফল্য থেমে গেল ওখানেই।

উইকেটে এলেন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার। প্রথম দিকের অস্বস্তিটুকু কাটিয়ে নিয়ে গাওয়ার এবং গুচ ক্রিজে শিকড় নামিয়ে দিলেন।

অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও উইকেটে ক্রমেই অনড় হয়ে উঠতে লাগলেন গুচ-গাওয়ার জুটি।

২০ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পরে দ্বিতীয় উইকেটে ওঁরা দুজনে যোগ করলেন অমূল্য ৩৫১ রান। প্রথম দিনের শেষে বর্ডারের ঘাড়ে দুর্ভাবনার বোঝা চাপিয়ে ইংল্যাণ্ড সংগ্রহ করল তিন উইকেটে ৩৭৬ রান। অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের ক্লান্ত এবং হতাশ করে যদি বা গাওয়ার আউট হলেন ১৫৭ রানে, গ্রাহাম গুচ অপরাজিত রইলেন ১৭৯ করে।

ডেভিড গাওয়ার

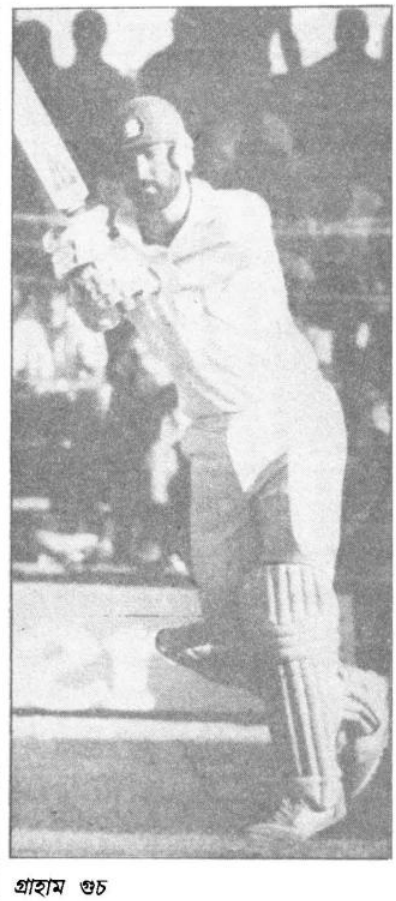

গ্রাহাম গুচ

দ্বিতীয় দিন ইংল্যাণ্ড অবশ্য ইনিংস দীর্ঘায়িত করতে পারেনি। শেষ ৭ উইকেট অস্ট্রেলিয়া তুলে নেয় ৮৮ রানে। কিন্তু ততক্ষণে ৪৬৪ রানের বিরাট পাহাড় গড়ে নিয়েছে ইংল্যাণ্ড। এবং অ্যাসেজ পুনরুদ্ধারের কাজটাও সেরে ফেলে অনেকটাই।

এই ম্যাচে ইংল্যাণ্ডকে হারানো আর সম্ভব হবে না, এই ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ানদের এতটাই হতাশ করে ফেলে যে, তারা দ্বিতীয় দিনের শেষেই ৬ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে সাজঘরে ফেরে ধুঁকতে-ধুঁকতে। তৃতীয় দিনে গ্রেগ রিচির (৬৪ নট আউট) সংগ্রামী ইনিংস সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া মুড়িয়ে যায় মাত্র ২৪১ রানে।

এই টেস্টের শুরুতে ইংল্যাণ্ড চেয়েছিল কোনওক্রমে একটা ড্র খুঁজে নিতে। কিন্তু মাত্র ২৪১ রানে অস্ট্রেলিয়া অল আউট হওয়ায় ইংল্যাণ্ড এই ম্যাচে জয়ের গন্ধ পেয়ে যায়। বিন্দুমাত্র দেরি না করে অস্ট্রেলিয়াকে ফলো-অন করান গাওয়ার। ২২৩ রানে পিছিয়ে-থাকা অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দফায় দ্রুত চার উইকেট খুইয়ে তৃতীয় দিনের শেষেই এক রকম হারের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

শুধু বর্ডার নামক মহীরুহটি তখনও ইংলিশ পেস-স্পিনের প্রবল ঝাপটার মুখেও উইকেটে দাঁড়িয়ে ছিল।

চতুর্থ দিন সকালে বর্ডারের (৫৮) বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার যাবতীয় প্রতিরোধ মাত্র ১২৯ রানে। ইংল্যাণ্ড ইনিংস ও ৯৪ রানে ম্যাচ জেতে। আগের টেস্টের সফল বোলার রিচার্ড এলিসন এই ইনিংসেও ৫ উইকেট নিয়ে বাঁকিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-মেরুদণ্ডটি।

অ্যাশেজ ফিরিয়ে আনলেন ডেভিড গাওয়ার। তাঁর খুশি হওয়ার আরেকটা কারণ, 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'-এর পুরস্কারটাও এবার পেয়েছেন তিনিই।

নটি ছড়ার বইতে যেন নতুন এক নবরত্ন-সভা

ছড়া শুনতে কার না ভাল লাগে বলো ? শুধু কি শোনা ? ছড়া মুখস্থ করতেও দারুণ লাগে, তাই না ? আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তোমাদের জন্য ন-নটি ছড়ার বই বেরিয়েছে । বলতে গেলে, এ যেন নতুন এক নবরত্ন-সভা ।

কিংবা বলা যায়, আহ্লাদে আটখানা, তার উপরে আবার একটা ফাউ । নটি বইই দারুণ । যেমন ধরো, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'হৈ রে বাবুই হৈ' । পড়লেই হইহই করতে ইচ্ছে হবে । প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ছড়া যায় ছড়িয়ে' মাথার মধ্যে ঠিক ছড়িয়ে যায় । আবার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনো'তেচেনা-চেনা শব্দ দিয়ে দারুণ মজার-মজার মিল । মজা বলতেই মনে পড়ে যায় 'সাদা বাঘ'-এর কথা । এ-বাঘ মোটেই দূর থেকে দেখার নয়, কোলের পাশে রেখে আদর করার । কেননা, বিমল দাসের ছবিতে আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়াতে এক অসামান্য উপহার 'সাদা বাঘ' । আবার আদিনাথ নাগের 'হিজঙ্গলের দেশে' বা গৌরী ধর্মপালের 'ঘোড়া যায়'—এ-দুটোও কম মজাদার ছড়া দিয়ে ভর্তি নাকি ? কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টা বলি ? মৌমাছির 'মৌ-মিছরি-মণ্ডা'তে খুব ছোট্ট, আরো বড়ো আর তারো বড়োদের জন্য তিনরকম ছড়া । যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'মামার বাড়ী' । পড়ে ছড়ার সঙ্গে শেখা যায় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ । সুধীর মৈত্রের ছবিতে সাজানো এবং রমাপদ চৌধুরীর ছড়াতে রাঙানো 'ভূতগুলো সব গেল কোথায়'ও দুর্ধর্ষ এক উপহার । তাই সব কটা বই-ই চাই । কাল নয়, এক্ষুনি ।

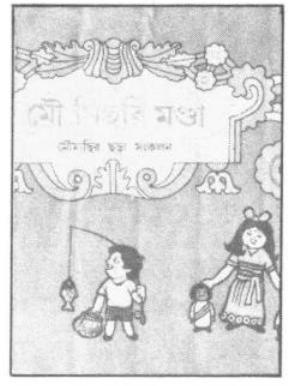

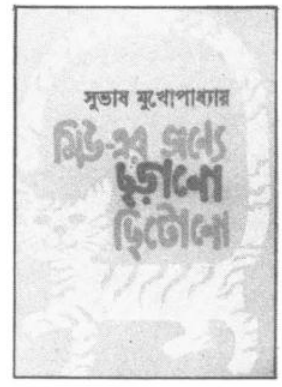

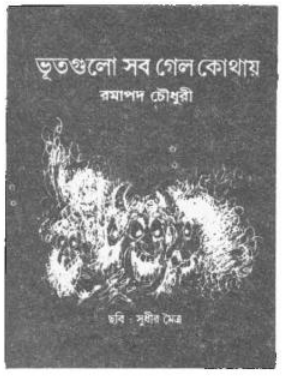

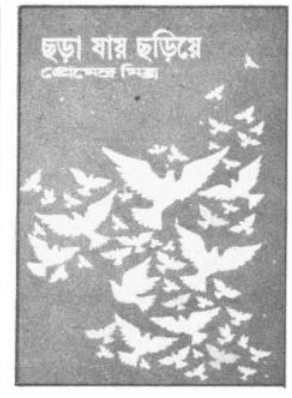

ছড়ার বই :

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ হৈ রে বাবুই হৈ ॥ ৬·০০ ● প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ছড়া যায় ছড়িয়ে ॥ ৫·০০ ● সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনো॥ ৬·০০ ● নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাস ॥ সাদা বাঘ ॥ ১০·০০ ● মৌমাছি ॥ মৌ মিছরি মণ্ডা ॥ ১০·০০ ● রমাপদ চৌধুরী ও সুধীর মৈত্র ॥ ভূতগুলো সব গেল কোথায় ॥ ২০·০০ ● যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ মামার বাড়ী ॥ ৮·০০ ● গৌরী ধর্মপাল ॥ ঘোড়া যায় ॥ ৬·০০ ● আদিনাথ নাগ ॥ হিজঙ্গলের দেশে ॥ ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

খেলার মাঠে গণ্ডগোল

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

খেলার মাঠে গণ্ডগোল নতুন কিছু ঘটনা নয়। আগে আমরা ভাবতাম, খেলার মাঠে গণ্ডগোল বিদেশে খুব কম হয়, কিন্তু ফুটবলে উন্নত দেশগুলিতে একেবারেই হয় না। ভুল ধারণা। এদেশে যেমন ফুটবল মাঠে দুর্ঘটনা হয়, তেমনি বিদেশে এবং ফুটবলে উন্নত দেশগুলোতেও খেলার মাঠে গণ্ডগোল হয়।

কিন্তু বিদেশের মাঠে ওই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলেই এদেশেও যে ঘটাতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। তাই আমরা এখন সবাই চেষ্টা করছি কী করে দেশের খেলার মাঠে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। আর এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কলকাতা। কারণ ভারতের ফুটবল-মাঠগুলিতে যেসব দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার অধিকাংশই হয়েছে আমাদের বড় আদরের এই মহানগরী কলকাতাতে। তাই এখন কলকাতার খেলার মাঠে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলেছে। এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যেমন সরকারি পক্ষ থেকে, তেমনই রাজ্য ফুটবল সংস্থা আই· এফ·এর পক্ষ থেকেও।

মেঠো হাঙ্গামা শুধু যে কলকাতা ফুটবলের পক্ষে ক্ষতিকর, তা নয়। সমগ্র মহানগরীর পক্ষেও ক্ষতিকর। যেহেতু এই সমস্ত হাঙ্গামার সঙ্গে মহানগরীর নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নও জড়িত থাকে।

কলকাতার ফুটবলের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে মাঠে গণ্ডগোল নতুন কিছু ঘটনা নয়, আর বিভিন্ন কারণে প্রতিযোগিতাও মাঝপথে বহুবার বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতে বহুবার কলকাতার আই· এফ· এ শিল্ড বন্ধ হয়ে গেছে খেলার মাঝপথে। আই· এফ· এ শিল্ড-এর ইতিহাসে ১৯৩৪ সাল এই রকম একটা বছর। ১৯৪৬ সালে আই· এফ· এ শিল্ড বন্ধ হল, এবারের কারণ দাঙ্গা। ১৯৫৯ আর ৬৪তে আবার খেলা বন্ধ হয়ে যায় প্রশাসনিক গণ্ডগোলের জন্য। আর ৮০ সালের কথা তো তোমরা সবাই জানো। লিগের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, লিগও বেশ কয়েকবার বন্ধ হয়ে গেছে। দাঙ্গার জন্য ১৯৩০ আর ১৯৪৭ সালে, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৫৩ সালে, ইনজাংশনের জন্য ১৯৬৮ সালে লিগের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ১৯৮০ সালে। ১৬টি তরুণের প্রাণের বিনিময়ে সে বছর কলকাতা লিগ ও আই· এফ· এ শিল্ড সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই অভিশপ্ত ১৬ আগস্টকে স্মরণ করে আজও আমরা ১৬ আগস্ট 'ফুটবলপ্রেমী' দিবস' হিসেবে পালন করি।

পুলিশ না-থাকায় বিনা বাধায় মাঠে ঢুকছে একশ্রেণীর দর্শক

কিন্তু এসব করেও কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা কি ময়দানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন ? মনে হয় না। মাঠের গণ্ডগোল যে মেটেনি তারই প্রমাণ পাওয়া গেল কিছু দিন আগে অনুষ্ঠিত দুটি প্রদর্শনী খেলা দেখে। মোহনবাগান বনাম মহমেডান, আর মহমেডান বনাম ইস্টবেঙ্গল দুটি ম্যাচে গণ্ডগোল হয়েছে। প্রথমে উত্তেজনা ছিল মাঠে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে, পরে সেই উত্তেজনা গ্যালারির দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। মোহনবাগান ও মহমেডান ম্যাচে সে ঘটনা সামলানো গেলেও ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান ম্যাচের সময় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মাঠের গণ্ডগোল গ্যালারিতে ছড়িয়ে পড়ায় শেষ চার মিনিট খেলা চালানো সম্ভব হয়নি রেফারির পক্ষে। ঘটনার পরে অনেক জল ঘোলা হয়েছে, অনেকে অনেকের নামে দোষ চাপাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতা, খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের অনুচিত আচরণ দর্শকদের উত্তেজিত করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই গণ্ডগোল এড়ানো যেত, যদি দর্শকরা সৌজন্যবোধের সঙ্গে এ-ঘটনার মোকাবিলা করতেন। তা হলে হয়তো গণ্ডগোল এত দূর গড়াত না। খেলার মাঠে দর্শকরা যদি সুস্থ মন নিয়ে খেলা দেখেন, এবং মাঠে সৌজন্যের পরিচয় দেন, তা হলে হয়তো মেঠো হাঙ্গামা এড়ানো যাবে, খেলাও বন্ধ হবে না।

মেঠো হাঙ্গামার ফলে ১৯৮০ সালের মতো লিগ এবার বন্ধ হল না বটে, কিন্তু কার্যত লিগের খেলা পরিণত হল প্রহসনে। রিটার্ন লিগের তিনটি বড় ম্যাচের প্রথমটি (ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান) তো হলই না।

কলম্বোতে কী কাণ্ড !

সুজয় সোম

একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে পরে ব্যাট করতে নেমে রান তাড়া করায় বেজায় রোমাঞ্চ ! রোববার, উনিশশো পঁচাশি সালের পঁচিশে আগস্ট সকালে কলম্বোর সিনহালেস স্পোর্টস গ্রাউণ্ডে টসে জিতেও তাই ভারতীয় ক্যাপ্টেন কপিলদেব নিখাঞ্জ ব্যাট করতে পাঠালেন শ্রীলঙ্কাকে। আঁটোসাটো বোলিং, ফিল্ডিংয়ের দাপটে আতান্তরে পড়লেন অমল সিলভা ও রবি রত্নায়েকে। দশ ওভারে টেনেটুনে ১৭ রান ! নিজের ১৩ রানে রবি মহিন্দর অমরনাথকে পেটাতে গিয়ে ডিপ মিড-অনে আরেক রবির মুঠোয় ধরা পড়লেন দলের ৩৪ রানে। আরও ৬ রান পরে অফস্পিনার গোপাল শর্মার বলে, তাঁরই হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন রঞ্জন মদুগালে। তৃতীয় উইকেটে অমল ও রয় ডায়াস দামি ৪২ রান জুড়লেন। রবি শাস্ত্রীর ঝোলানো একটা বল সজোরে লিফট করে বাউণ্ডারি পেয়ে ৩৬ রানে পৌঁছলেন অমল। পরের বলটাও একই প্যাটার্নের। অমল স্টেপ-আউট করে বলটা তুললেন। সময়ের হিসেবে ভুল হল। খানিক দৌড়ে চমৎকার ক্যাচ নিলেন চেতন শর্মা। রয় ও বাঁ-হাতি অর্জুন রণতুঙ্গের ১১০ রানের অ্যাটাকিং পার্টনারশিপও (পঁয়ষট্টি মিনিট, এগারো ওভার) ভেঙে দিলেন চেতন। দুজনকেই বোল্ড করলেন, ৩৫ রান আগে-পরে। রবি শাস্ত্রী বা লেগস্পিনার লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণনকে তাচ্ছিল্য করে অষ্টাশি মিনিটে রয়ের ঝলমলে, মেজাজি ৮০ রানে চোখ-জুড়নো আটটা বাউণ্ডারি, একটা ব্রিলিয়ান্ট ছয়। অর্জুনের পঁয়ষট্টি মিনিটের জমাটি ইনিংসে পাঁচটা চার, একটা ছক্কা। ৪৬ বলে তাঁর রোজগার ৬৪ রান। ৪ রানে অরবিন্দ ডি'সিলভার উইকেটও বেমালুম ছিটকে দিলেন চেতন। তিনিই দিনের সবচেয়ে সফল বোলার : ৯-২-৫০-৩ ! দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান অধিনায়ক দলিপ মেণ্ডিস (২৯) ও অশান্ত ডি'মেল (২) দলের ছয় উইকেটে ২৪১ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন, ইনিংসের পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওভার ফুরিয়ে যেতেই।

জেতার জন্য ওভার পিছু ৫·৩ রান দরকার। ভারতের ওপেনিং জুটি কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত ও রবি শাস্ত্রী বড্ড বেশি সতর্ক হয়ে, ধীরেসুস্থে খেলতে লাগলেন। সে কী ঝিমুনি ক্রিকেট ! স্পিড বাড়ল দশ ওভারের পর। দলের ৭৬ রানে শ্রীকান্ত বাঁ-হাতি স্পিনার রজার বিজেসূর্যর বলে বেদম জোরে

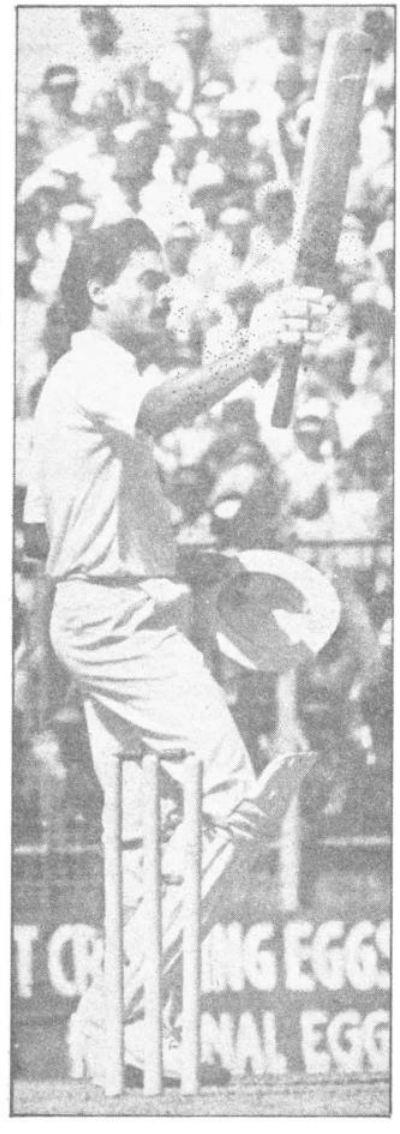

জয়ের নায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকর

ব্যাট চালাতেই বল উঁচু হয়ে লং-অন বাউণ্ডারিতে চলে গেল। পড়ি-মরি ছুটে ক্যাচ নিলেন অশান্ত। আম্পায়ারমশাই ছক্কার সঙ্কেত দিতেই শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়রা আপত্তি জানালেন। অমনি ডান হাতের তর্জনী তুলে আউটের ঘোষণা ! শ্রীকান্তর ২৯ রানে এক জোড়া চার, একটা ছয়।

চা-বিরতির পরেই রজারের আর্মারে ঠকে গিয়ে ৭ রানে বোল্ড হলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ২-৮১। ক্রিজে এলেন দিলীপ বেংসরকর। রবির আত্মবিশ্বাসী ৬৭, কপিলের মারকুটে ২৪ রান কিংবা অসুস্থ মহিন্দর ২, এবং রান আউটের কবলে পড়ে শূন্য রানের সুনীল গাওস্কর, চেতন শর্মার ৮ রান ছাপিয়ে দিলীপ ভারতকে টেনে নিয়ে গেলেন জয়ের দোরগোড়ায়। ৮৯ রানে তাঁর ইনিংস (একশো চার মিনিটে এগারোটা তুখোড় বাউণ্ডারি, একটা বিরাট ছক্কা) যখন নিজের হুটোপুটিতেই খোয়া গেল, দলের রান আট উইকেটে ২৩৪, খেলা শেষ হতে দশটা বল বাকি। খুচরো রান চুরি না করে রুমেশ রত্নায়েকের বলে খামোখা ছয় হাঁকাতে গিয়ে একেবারে রবি রত্নায়েকের মুঠোয় !

তখনই আমাদের ব্লাডপ্রেশার চড়ে গেল। সদানন্দ বিশ্বনাথ আর শিবরামকৃষ্ণনকে ঘিরে ধরলেন ফিল্ডাররা। বল এবং রানের হিসেব কষতে লাগলাম। ভাবো একবার, শেষ ওভারে জেতার জন্য যখন ৬ রান দরকার, বুকটা কেমন ধুকপুক করছিল ! দুরন্ত মিডিয়াম পেসার অশান্ত ডি'মেলের প্রথম বলটা বাউণ্ডারি লাইন পেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় বলটাকে খোঁচা মেরেই সদানন্দ হুড়মুড় ছুটলেন···ব্যস, দু'দলই সমান সমান। পরের বলটা তুমুল বেগে উইকেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। প্রায় চোখ বুজেই ব্যাট চালালেন শিবা। খচ্‌মচ্‌ করে প্রান্ত বদলে নিলেন।

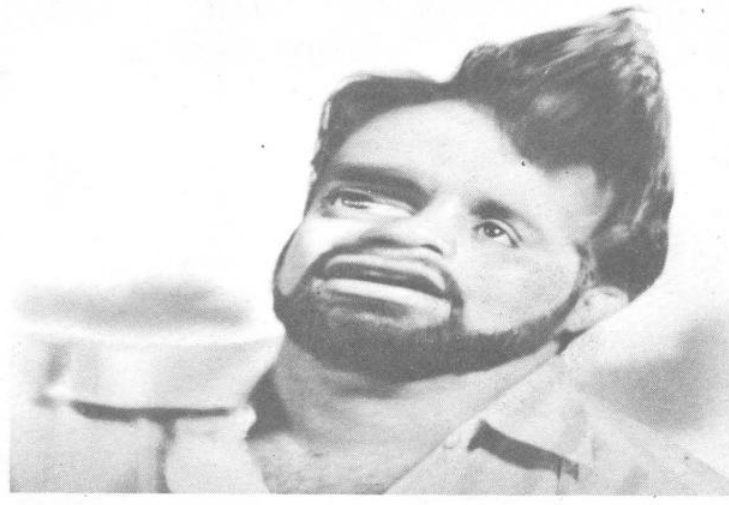

"ও সবসময় একটা আধুনিক রান্নাঘরের
স্বপ্ন দেখতো! একটা উঁচু জায়গায় স্টোভ,
দেয়ালে ক্যাবিনেট। কিন্তু প্রত্যেক বারই পয়সাটা
অন্য কিছুতে খরচা করে ফেলতাম। এখন,
বড্ড দেরী হয়ে গেছে। যদি জানতাম, যদি...!"

সামান্য অজ্ঞতার ফলে আপনার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে, আপনার সুখের জীবন নষ্ট করে দিতে পারে।

প্রতি বছর রান্নাঘরেই বেশী অগ্নিকাণ্ড হয়। অথচ আমাদের বিশ্বাস — আমাদের নিজের রান্নাঘরে কখনও কিছু হতে পারে না — কারণ আমাদের ভাগ্য ভালো!

রান্নাঘরের নিরাপত্তার সঙ্গে ভাগ্যের কোনোই সম্পর্ক নেই। গ্যাস আর কেরোসিন স্টোভ, কাঠকয়লার উনুন আর দেশলাইয়ের কাঠি অসাবধানে ব্যবহার করলে, এমনকি অজ্ঞতার দরুনও প্রাণহানি হতে পারে।

মনে রাখবেন, একমাত্র আপনিই আপনার নিজের বাড়ীটি নিরাপদ রাখতে পারেন। একমাত্র আপনিই আপনার বাড়ীতে আগুন ধরা নিবারণ করতে পারেন। কারণ, আপনি না করলে, অন্য কেউ তা কখনও করবে না।

আপনার কি কি করা উচিত:

* আপনার স্টোভ সবসময় উঁচু জায়গায় রাখবেন, মেঝেতে কখনও নয়।
* যখন গ্যাস স্টোভ ব্যবহার করবেন, প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর সিলিণ্ডারের ভাল্‌ভ আর বার্নারের নব দুইই বন্ধ করে দেবেন।
* কয়লা বা কাঠকয়লার উনুনের দিকে সবসময় নজর রাখবেন। ব্যবহারের পর জলের ছিটে বা ঢাকা দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেবেন।
* দেশলাই বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখবেন।
* দেশলাই, কেরোসিন আর অন্যান্য জ্বালানী— স্টোভ থেকে দূরে রাখবেন।

আপনার কি কি এড়িয়ে চলা উচিত:

* পাম্প-স্টোভে কখনও অতিরিক্ত পাম্প করবেন না, ফেটে যেতে পারে।
* দেশলাই জ্বালবার আগে কখনও বার্নারের নব ঘুরিয়ে খুলবেন না।
* রান্না করার সময় কখনও ঢিলেঢালা ঝলঝলে কাপড়জামা পড়বেন না।
* বাচ্চাদের কখনও রান্নাঘরে খেলতে দেবেন না।
* স্টোভের ঠিক ওপরে বা কাছে কখনও শেল্‌ফ, পর্দা, ক্যালেণ্ডার বা কাপড় শুকোনোর দড়ি লাগাবেন না ওগুলোতে সহজে আগুন লাগতে পারে।

আপনার বাড়ীটিকে স্নেহভালোবাসা আর আনন্দে ভরে তুলেছেন। এবার নিরাপদও করে তুলুন।

লস প্রিভেনশন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(জেনারেল ইন্সিওরেন্স ইণ্ডাস্ট্রীর সৌজন্যে)

বিনামূল্যে বাংলা পুস্তিকা 'গৃহ সুরক্ষার পথ-প্রদর্শক' পেতে হলে নিচের ঠিকানায় লিখুন:
লস প্রিভেনশন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
DF/BEN ঈগল্ হাউস, ৪, গভর্ণমেণ্ট প্লেস (নর্থ), কোলকাতা ৭০০ ০০১

CLARION/B/LP/10/244 BEN

ANANDAMELA 2 OCTOBER, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

আচ্ছা, কাচবার পর আপনার কাপড় জামা ঠিক ধবধবে সাদা হয় কি?

"আমি তো সেরা ডিটারজেন্ট পরিষ্কার করেই কাচি... কিন্তু ধবধবে সাদা কি হয়?"

"এ ব্যাপারে আমি কিন্তু সামান্য একটু বেশি নজর দিই।

রবিনে ডুবিয়ে ধবধবে সাদা করে নিই।"

আপনার মতো আমিও বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট দিয়েই কাপড় কাচি–কিন্তু শুধু ডিটারজেন্টে ঠিক যেন ধবধবে সাদা হয় না।

তাই তো **রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে** একবার ডুবিয়ে সত্যিকারের সাদা করে কাচা শুরু করলাম।

রবিন কাপড় চোপড় ধবধবে সাদা করার উপাদান। এতে তেমন কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য নেই যা আপনার কাপড়ের রং জ্বলিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

রোজ কাপড় ধোবার পর রবিনে ডোবালে দেখবেন দিনে দিনে ধবধবে ভাবটা বেড়েই চলেছে। আর আপনার কাপড় জামা বা হাতেরও কোন ক্ষতি হবে না।

জামা কাপড় যেমন কাচেন, তেমনিই কাচুন। শুধু কাচবার পর একবার রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে ডুবিয়ে নিন। দেখবেন কি ধবধবে সাদা হয়ে গেল। আর পাঁচজনে দেখলে ভাববে, বাঃ! কাচবার পর কি যত্ন নিয়ে সাদা করা।

ROBIN
Fabric Whitener

Regd.

Dip-it-in Robin
for extra whiteness.
Super safe for clothes.

রবিন
ফেব্রিক হোয়াইটনার

এখন পাবেন সুবিধাজনক স্যাশেতে!

কাপড় জামা একবার ডোবালেই ধবধবে সাদা, সম্পূর্ণ নিরাপদ!

CLARION C-RCR-1